বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন

আবুল বারকাত
অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, info@hdrc-bd.com)

জাতীয় সেমিনার ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত
"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ: আমাদের করণীয়" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ

বাংলাদেশ অথনাাত সমিতি

ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ঢাকা
২৮ চৈত্র ১৪২১/ ১১ এপ্রিল ২০১৫

বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন

আবুল বারকাত
অধ্যাপক
অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(ই-মেইল: hdrc.bd@gmail.com, info@hdrc-bd.com)

জাতীয় সেমিনার ২০১৫

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত
"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ: আমাদের করণীয়" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ

বাংলাদেশ অথনাাত সমিতি

ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ঢাকা
২৮ চৈত্র ১৪২১/ ১১ এপ্রিল ২০১৫

© আবুল বারকাত

প্রথম প্রকাশ: ২৮ চৈত্র ১৪২১/১১ এপ্রিল ২০১৫

প্রকাশক
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৩৪৫৯৯৬
ই-মেইল: bea.dhaka@gmail.com
ওয়েব সাইট: www.bea-bd.org

মূল্য: ১০০ টাকা, ইউএস ১০ ডলার
(বিক্রয়লব্ধ অর্থের সম্পূর্ণ ব্যয় হবে বাংলার পাঠশালা পরিচালন কর্মকাণ্ডে)

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং
২৭ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা
ফোন: ০১৯৭১ ১১৮২৪৩
ই-মেইল: agami.printers@gmail.com

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
**"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও
মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক:
সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন"**

Prof. Dr. Abul Barkat
"Culture of Injustice, Communalism, Fundamentalism and
Fundamentalist Militancy: Emergence, Nature, Expansion and Causality.
Solution lies not in Reforms, but in Radical Changes"

Published by
Bangladesh Economic Association
4/c Eskaton Garden Road, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone 880-2-9345996
E-mail: bea.dhaka@gmail.com
Web: www.bea-bd.org

ISBN 978-984-33-9071-4

Price: Tk 100 (Bangladesh), US$ 10 (outside Bangladesh)
(All sales proceed from this publication will be used solely for the
purpose of activities of the Bangladesh Economic Association)

উৎসর্গ

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দশ লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা বোন,
পঙ্গুত্ববরণকারী ও দরিদ্র-বঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধা,
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রামে নিবেদিত
তরুণ প্রজন্মকে

বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি ও কার্যকারণ সম্পর্ক: সমাধানে সংস্কার নয় প্রয়োজন আমূল পরিবর্তন

আবুল বারকাত

সারকথা: ‘বিচারহীনতা’, ‘সাম্প্রদায়িকতা’, ‘ইসলামের নামে ধর্মীয় মৌলবাদ’, ‘ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী জঙ্গিত্ব’— এসবই সমাজ বাস্তবতা। সামাজিক এ বাস্তবতা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ভর নয়, তা ব্যক্তির ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, এবং শেষবিচারে সামাজিক বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার কার্য-কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত। কার্য-কারণগতভাবেই বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন ব্যবস্থাটাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে; ইতিহাসের গতিপথে আবির্ভূত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, সমস্ত ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থা, সমস্ত তাত্ত্বিক মতবাদের সারবস্তু অনুধাবন সম্ভব শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট যুগে বিদ্যমান জীবনের বৈষয়িক অবস্থা অনুধাবন করেই; এবং মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্য নির্ধারণ করে। সামাজিক বিজ্ঞানের এসব চিন্তন পদ্ধতির নিরিখে বলা যায়— ‘বিচারহীনতার সংস্কৃতি’ এখন এক ‘জগদ্দল সংস্কৃতি’। এ সংস্কৃতি সমাজ দেহের গভীরে প্রোথিত এমন এক বিষের বীজ যা সমাজ দেহের সর্বত্র পচন ধরায়, সমাজ দেহের অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনার শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, মানুষের সৃজনক্ষমতা আর মুক্তচিন্তার স্বাধীনতার শক্তিকে নির্জীব করে দেয়, মুক্তবুদ্ধি ও আলোকিত মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিচারের সমগ্র প্রক্রিয়াসহ বিচারের রায় যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য সেহেতু সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির ‘অধিকার’ পান শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান-সর্বসবল রেন্ট সিকার ধনীরা যারাই রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। এই ‘অধিকার’ সবলের সম্পত্তি— একচেটিয়া সম্পত্তি। স্থান-কাল-পাত্রভেদে শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সবল সত্তা যেখানে-যেভাবে-যে অবস্থায়, যার বিরুদ্ধে যা করবে সেটাই তার (সবলের) অধিকার। দুর্বলেরও অধিকার আছে, তবে তা স্ব-নির্ধারিত নয়, সবল সত্তা দুর্বলকে যা-যেভাবে-যখন-যে শর্তে করতে বলবে তা প্রতিপালনই ‘দুর্বলের অধিকার’। অনুরূপভাবে “সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব” শুধু বাস্তব সত্যই নয় এসব এখন ‘অশুভ আগ্রাসী সংস্কৃতিতে’ রূপান্তরিত হয়েছে। এমন আগ্রাসী সংস্কৃতি যে জনগণের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে প্রতিহত না করতে পারলে শোষণ উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতার কাঠামোতে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভুর স্বার্থরক্ষায় তারই ইশারা-ইঙ্গিতে ইসলাম ধর্ম ব্যবহারকারী মৌলবাদী মতাদর্শিক জঙ্গিত্ব (যারা ধর্মের mythos এর সাথে বাস্তবের logos এর সফল-সম্মিলন ঘটাতে পেরেছেন) রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই দখল করে নেবে। এ কোনো কল্পকাহিনী নয়। এক্ষেত্রে ‘ক্ষতিহ্রাস কৌশল’ হিসেবে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তিকে জোরদার করতে হবে, আর অন্যদিকে এ মহাবিপর্যয়ের স্থায়ী সুরাহার জন্য শোষণমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেই উল্টে শোষণহীন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হবে। “বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের” কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র ও চক্রাবর্তন হলো এরকম:

“শোষণ → সবলের অধিকার আর দুর্বলের অধিকারহীনতা → আরো বেশি শোষণ”

এই সূত্রে মূল কথা হলো নিজ দেশে শোষণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখবেন যে ব্যবস্থা বৈশ্বিক শোষণ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অধীনস্থ অংগ আর একই সাথে চাইবেন বৈষম্যহীন সমাজ, সবার জন্য সমসুযোগের সমতা অথবা সমতাধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান নীতির ভিত্তিতে ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার-সুবিচার-আইনের শাসন, বিচ[illegible]গারিক অধিকার ও মানব-অধিকার, ধর্মভিত্তিকসহ বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি, দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-জ্ঞানজাগতিক-মনোজাগতিক প্রগতি ও উৎকর্ষ সৃষ্টির পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করা, শাসকদের স্বেচ্ছাচার-স্বৈরাচার-স্বৈরশাসন থেকে জনগণের মুক্তি, লুটেরা-দুর্বৃত্ত আগ্রাসী রেন্ট সিকারদের হাত থেকে মুক্তি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও মারপ্যাচ থেকে মুক্তি— এ সবের কোনটিই ঘটবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কার্যকারণগতভাবেই বিষয়টি

অর্থনৈতিক তবে রাজনীতিই মূখ্য, কারণ রাজনীতিই অনুরূপ সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামো বিনির্মাণ করে দেয় এবং তা জিইয়ে রাখতে প্রধান ভূমিকা রাখে। আর রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সরকারনীতি যখন শোষক রেন্ট সিকার লুটেরা-দুর্বৃত্তদের অধীনস্থ দাস সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয় তখন চক্রাবর্তনের সূত্র "শোষণ সবলের অধিকার আর দুর্বলের অধিকারহীনতা আরো বেশি শোষণ" স্ব-প্রসারণশীল রূপ নেয়। সুতরাং, শেষ বিচারে "বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসব মহাবিপর্যয়কারী অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির বিষয়টি তথাকথিত সংস্কার বা রিফর্ম সংশ্লিষ্ট গোঁজামিলের বিষয় হতে পারে না; সমাজ কাঠামোর মৌলিক বা আমূল পরিবর্তনই মুক্তির একমাত্র পথ। তবে বৈশ্বিক সমাজের অর্থনীতি ও রাজনীতির যে কাঠামো এখন বিদ্যমান ও চলমান সে অবস্থায় শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী দেশসমূহের মধ্যে একক কোনো দেশের পক্ষে ঐ আমূল-মৌলিক-বৈপ্লবিক পরিবর্তন-রূপান্তরের আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার এই পরিবর্তন সম্ভব যদি বৈপ্লবিক এ পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই সাথে একই সময়ে এ পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেইসাথে সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনকামী এসব দেশসমূহের মধ্যে সংহতি ও একাত্মতা সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে এক ধরনের কৌশলগত কার্যকর জোট সৃষ্টি করা যায় যে জোটের নাম যাই হোক অন্তর্গত চেতনা হবে 'মুক্তির আন্তর্জাতিকতা' (বা Liberation International)।

নির্যাস শব্দগুচ্ছ: বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, মানবাধিকার, যুদ্ধাপরাধ, পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক সিস্টেম, অর্থনীতির ইতিহাস, অর্থনীতি চিন্তার ইতিহাস, মার্কসিয় চিন্তার ইতিহাস, বিত্ত-সম্পদ-সম্পত্তি, বিত্ত-সম্পদের বণ্টন, সমতা ও ন্যায়বিচার, রেন্ট সিকার প্রক্রিয়া, উৎপাদন ও পুঁজি, সম্পত্তি আইন, মামলা প্রক্রিয়া, গোষ্ঠি আচরণ, উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-প্রাকউপনিবেশবাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতি, বিশ্বায়ন, প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধ, সামাজিক পছন্দ, চুক্তি তত্ত্ব, কল্যাণ-জনসমৃদ্ধি-দারিদ্র্য, সংখ্যালঘু ও বৈষম্য, বঞ্চনা-বৈষম্য,

জেইএল শ্রেণি নং: P1, NOO, B14, B3, E21, D31, D6, D63, D72, D24, K11, K4, C92, F54, D74, F5, F6, H56, D71, D86, I3, J15, J71,

১। প্রাককথন:

এ প্রবন্ধের জন্ম-কথা

এই প্রবন্ধের মৌল বিষয়সমূহ স্বাধীনতার চুয়াল্লিশতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ঢাকার শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে গণজাগরণ মঞ্চ আয়োজিত "বিচারহীনতার সংস্কৃতি, মৌলবাদের উত্থান: আমাদের করণীয়" শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় ২৫ মার্চ ২০১৫ তে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পাঠ করা হয়েছিল। ঐ মুক্ত আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের স্বনামখ্যাত প্রগতিবাদী অধ্যাপক ড. অজয় রায়— যিনি মৌলবাদী জঙ্গিদের খুনের "সফল টার্গেট" মুক্তচিন্তার প্রগতিশীল মানুষ বিজ্ঞানী অভিজিত রায়ের পিতা। ড. অভিজিত রায়কে খুন করা হয় বাংলা একাডেমি বই মেলা উৎসব প্রাঙ্গনে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে। আমরা যতটুকু জেনেছি এই খুনের দায়দায়িত্ব স্বীকার করলো অন্যতম মৌলবাদী সশস্ত্র জঙ্গি সংগঠন— আনসারুল্লাহ বাংলা টিম। মৌলবাদী জঙ্গিদের হাতে নিরস্ত্র ড. অভিজিত রায় খুন হলেন আর একদিকে যেমন মানুষের নিরাপত্তা বিধানে নিয়োজিত "পুলিশ" নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলো আর অন্যদিকে অকুস্থলে সাধারণ মানুষও সাথে সাথে এগিয়ে এলো না। স্বভাবত খুবই সাধারণ অথচ কৌতুহলী প্রশ্ন— পুলিশ কেনো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে খুন অবলোকন করতে থাকলো? আর আশেপাশের মানুষ-জনই বা কেনো এগিয়ে এসে প্রতিরোধ তো নয়ই প্রতিবাদও করলো না? পুলিশের নিশ্চুপ অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক কোনো কালক্ষেপণ না করেই বললেন "পুলিশের নীরব ভূমিকা-সংশ্লিষ্ট আচরণের জন্য দেশের প্রধান পুলিশ কর্মকর্তা ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের পদত্যাগ করা উচিত ছিলো"। আর খুন অবলোকনকারী আশেপাশের মানুষ কেন নীরব থাকলেন? মানুষের মনের গভীরে কি কোনো ভীতি ফ্যাক্টর কাজ করছে? এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডও কি মানুষের গা সওয়া হয়ে গিয়েছে? মানুষ কি বিচারহীনতার সংস্কৃতি মেনে নিয়েছেন? মৌলবাদী জঙ্গিরা ড. অভিজিতকে হত্যা করার এক মাস পরে (৩০ মার্চ ২০১৫) দিনদুপুরে সকাল ১০টার দিকে ঢাকা শহরের তেজগাঁও এলাকায় গণজাগরণ মঞ্চের কর্মী ওয়াশিকুর রহমান বাবুকে হত্যা করলো। হত্যাকারী জঙ্গিদের হাতে-নাতে ধরে ফেললো তারা যাদেরকে আমাদের সমাজ স্বীকৃতি দেয় না— কারণ তারা পুরুষ নন নারী নন— তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ (যাদেরকে সমাজ নাম দিয়েছে "হিজড়া"!)। এ হত্যা শেষ হত্যা নয়, ওদের অভিধানে "শেষ হত্যা" বলতে কিছু নেই, ওরা আরো অনেক মানুষ হত্যা করবে— হত্যা করবে মুক্তচিন্তার, মুক্তবুদ্ধির, প্রগতিশীল, দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক মানুষকে। এসবই এখন সাধারণ ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এবং নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে এসব আদৌ সাধারণ ঘটনামাত্র নয়।

আমাদের স্বাধীনতার চুয়াল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ২৫ মার্চ (২০১৫)-এ ঢাকার শাহবাগ প্রজন্ম চত্বরে মুক্ত-উন্মুক্ত আলোচনা সভার আয়োজক গণজাগরণ মঞ্চের কর্মীবৃন্দ যখন আমাকে মূল প্রবন্ধ লেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন তখন ভেবেছিলাম যে তারা গণজাগরণ মঞ্চের তরুণ কর্মী বিধায় গণজাগরণ মঞ্চের ঐতিহাসিক ৬ দফার (ঢাকার শাহবাগের প্রজন্ম চত্বরে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩-এ ঘোষিত) ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও চলমান পেট্রোল বোমার "বর্বর-অসভ্য সংস্কৃতি" নিয়ে লিখতে বলবেন। এ নিয়ে আমার প্রাক-ভাবনা খুব ভুল হয়নি। কারণ 'সংস্কৃতি' আছে তবে পেট্রোল বোমার সংস্কৃতি নয়, তার চেয়েও ভয়াবহ-বর্বরতম 'সংস্কৃতি' যা থেকে পেট্রোল বোমার সংস্কৃতি সৃষ্টি-পুনসৃষ্টি হয়— "বিচারহীনতার সংস্কৃতি"। আর সেইসাথে— একই সাথে— আছে "গণজাগরণ মঞ্চের ঐতিহাসিক ৬ দফা, যুদ্ধাপরাধী বিচার ও ধর্মের নামে মুক্তবুদ্ধি-মুক্তচিন্তা-মুক্তমনের মানুষ হত্যা"— এক কথায় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের বিষয়াদি। কিন্তু ২৫ মার্চ ২০১৫-এর প্রবন্ধে যা ছিলো না তাহলো "যা হচ্ছে তা কেন হচ্ছে"— এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর; ছিলো না এ নিয়ে কার্যকারণগত রাজনৈতিক অর্থনীতি সূত্র। আজকের প্রবন্ধে ঘটনার চেয়ে ঘটনার পিছনের কারণ অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হয়েছে যা এখনও পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান সাহিত্যে অনুপস্থিত। প্রয়াস নেয়া হয়েছে সামগ্রিকতার বিচারে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির রাজনৈতিক-অর্থনীতিক সূত্রবদ্ধকরণের।

২। প্রচলিত ধারায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবনা-চিন্তার মর্মার্থ কি এবং কেনো?

চিন্তার পদ্ধতিতত্ত্বিয় ভ্রান্তি প্রসঙ্গে

প্রবন্ধের শুরুতেই "বিচারহীনতার সংস্কৃতি", "সাম্প্রদায়িকতা", "মৌলবাদ", মৌলবাদী জঙ্গিত্ব — এসব নিয়ে প্রচলিত ধারণার চিন্তা ও লেখনির পদ্ধতিগত কয়েকটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রয়োজন বোধ করছি প্রধানত এ কারণে যে এসব বিষয় নিয়ে এতদিন যা কিছু লেখালেখি-বক্তৃতা-বক্তব্য হয়েছে প্রায় সবকিছুতেই বিষয়ের কারণ ও পরিণাম গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কারণকে পরিণাম হিসেবে চালিয়ে দেয়া আর পরিণামকে কারণ হিসেবে চালিয়ে দেয়া— পদ্ধতিতাত্ত্বিক এ ভ্রান্তি লেখকের বা বক্তার স্বেচ্ছায় নাকি অনিচ্ছায় ঘটেছে তা আমার জানা নেই। তবে মূল বিষয় বিশ্লেষণে আমি অজুহাতের কোনো কমতি দেখি না। এক্ষেত্রে পদ্ধতিতত্ত্বিয় ছয়টি বিষয় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ বিষয় ছয়টি নিম্নরূপ:

প্রথমত: দেশে-বিদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট যে সব বিষয়ে বা শিরোনামে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-কনফারেন্স-গোলটেবিল বৈঠক-ডায়ালগ হয় প্রায়ই ধরে নেয়া হয় যে এসবই মনুষ্য সমাজের প্রধানতম সমস্যা; এও ধরে নেয়া হয় যে ঐ সব সমস্যার সমাধান হলেই দুনিয়াটা বেহেশ্‌তে পরিণত হয়ে যাবে। এ ধারণা ভ্রান্ত। আজকের জাতীয় সেমিনার ও উপস্থাপিত প্রবন্ধের শিরোনামের ক্ষেত্রেও তা সমভাবে প্রযোজ্য— বিষয়বস্তুর সময়োপযোগিতা ও গুরুত্বমাত্রা যাই হোক না কেন। এ নিরিখেই শুরুতেই স্পষ্ট বলা প্রয়োজন যে, "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" আর "ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ"— এসবই বাংলাদেশের এমনকি আজকের বাংলাদেশের প্রধানতম বিষয় নয় (কেন নয় তা পরে বিশ্লেষণ করেছি)। এসব হতে পারে অন্যতম প্রধান বিষয়— বলা যায় অন্যতম মূখ্য বিষয়াদি (leading issues) অথবা অগ্রগামী বিষয়াদি (frontier issues)। যেমন ক্রমর্বমান দারিদ্র্য, বৈষম্য, অসমতা, মুক্তবুদ্ধি চর্চার সংকট, আলোকিত জ্ঞান সমৃদ্ধ মানুষ গঠনে শিক্ষার সংকট, সুস্থ-সবল (well-being অর্থে যা ill-being এর উল্টো) মানুষ গড়নে স্বাস্থ্য সেবার সংকট— এসবের সাথে আজকের প্রবন্ধের শিরোণামের বিষয়বস্তুর গভীর যোগসূত্র আছে; আছে পরস্পর-নির্ভরশীলতা সূত্র। কিন্তু উল্লেখিত দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা থেকে শুরু করে মুক্তচিন্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংকট সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি আজকের উত্থাপিত প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর তুলনায় অনেক গভীরের এবং গুরুত্বক্রমানুসারে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর তাই যৌক্তিক কারণেই আমি সংশ্লিষ্ট যোগসূত্র, কার্য-কারণ, কারণ-পরিণাম, লক্ষ-উপলক্ষ্যের দিকে বেশি গুরুত্ব দেবো।

দ্বিতীয়ত: প্রবন্ধের শিরোণামে 'সংস্কৃতি' (culture) প্রত্যয় যুক্ত আছে। আমার মতে বিচারহীনতা যেমন সংস্কৃতি তেমনি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ ও সংস্কৃতি। সংবিধানই যখন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে "রাষ্ট্রের ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে" সেখানে ধর্ম ও উদ্ভূত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তো 'রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রসঙ্গটি আরো স্পষ্ট করার স্বার্থে সংস্কৃতির সংজ্ঞাগত বিতর্কে (definitional debate on culture) না জড়িয়ে (তবে বিষয়টি "সংস্কৃতি" বিষয়ক অন্য একটি প্রবন্ধ এমনকি মোটা গ্রন্থের উপযোগী উপাদান হতে পারে) কিছু ধারণামূলক কথা বলা সঙ্গত মনে করি। 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়টির (category অর্থে) সর্বজনস্বীকৃত কোন একক সংজ্ঞা নেই যদিও সংস্কৃতির সম্ভাব্য উপাদান কি কি হবে তা নিয়ে বিতর্ক কমই আছে বলা চলে (এর অর্থ এই নয় যে বিতর্ক নেই)। তবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আলোচনার সুবিধার্থে এবং দিকভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা হ্রাসে 'সংস্কৃতি' প্রত্যয়টির মর্মার্থ ও সারবস্তুসহ উপাদানসমূহ উল্লেখ করা প্রয়োজন। সংস্কৃতি প্রত্যয়টির মর্মবস্তু ব্যাপক। তবে ক্ষুদ্রার্থে সংস্কৃতি বলতে যা কিছু বোঝানো হয় তা নিম্নরূপ: 'সংস্কৃতি' হলো জ্ঞান-অভিজ্ঞানের সিস্টেম যা তুলনামূলক বৃহৎ জনগোষ্ঠি মান্য করে; 'সংস্কৃতি'— মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সাফল্য ও অগ্রগতির বহিঃপ্রকাশ; 'সংস্কৃতি'— নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠি অথবা সমাজে বসবাসরত মানুষের ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি, সামাজিক আচরণ, আচার-অনুষ্ঠানের সমাহার; 'সংস্কৃতি' হ'ল সাংকেতিক বা প্রতীকী যোগাযোগ যার মধ্যে আছে গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের জ্ঞান-অভিজ্ঞান, শিক্ষা, দক্ষতা, ভাষা, আচরণ, প্রবৃত্তি, মূল্যবোধ, ধর্ম, খাদ্য, খাদ্যাভাস, সামাজিক আচরণ, মনোভঙ্গি, বিশ্বাস, সংগীত; 'সংস্কৃতির' মৌল উপাদান হ'ল ভাষা, ধর্ম, মূল্যবোধ ও আচরণবিধি, মনোভাব, সামাজিক সংগঠন, প্রযুক্তি ও বৈষয়িক সংস্কৃতি, বিধি-বিধান আইন, রাজনীতি, আচার অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা, ক্ষমতা, সৌন্দর্যানুভূতি (দেখুন, সরদার ফজলুল করিম, ২০১২, দর্শন কোষ, পৃ: ১১৯-১২০, ঢাকা: প্যাপিরাস)। আপেক্ষিক হলেও ভাবগত সৃষ্টিকে "আত্মিক সংস্কৃতি" এবং দেহগত সৃষ্টিকে "বৈষয়িক সংস্কৃতি" বলা সঙ্গত হবে। আত্মিক ও বৈষয়িক সংস্কৃতির মধ্যে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। কারণ কোন আত্মিক সংস্কৃতিই দেহ এবং বৈষয়িক অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে সৃষ্টি হতে পারে না। আবার কোন বৈষয়িক কর্মই মনের কল্পনা ও চিন্তন বাদে সাধিত হতে পারে না। সুতরাং 'সংস্কৃতি' এক ব্যাপক অর্থবহ প্রত্যয় (category অর্থে) যা মানুষের সর্বপ্রকার বৈষয়িক এবং আত্মিক সৃজন ও সম্পদের ঘনীভূত

প্রকাশ। সংস্কৃতি সর্বদাই মানুষের সৃষ্টি; সমাজ-বহির্ভূত সংস্কৃতি বলে মানুষের কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না। সে কারণেই প্রধানত: সমাজ-সংগঠনের বিশিষ্ট রূপ দিয়েই সমাজের সংস্কৃতির রূপ-কাঠামো নির্দিষ্ট হয়। শ্রেণিভেদহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজের সংস্কৃতি আর শ্রেণিভেদ সম্পন্ন দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের 'সংস্কৃতি' মৌলিক কারণেই এক নয়, ভিন্ন; আবার শ্রেণিভেদ-সম্পন্ন দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী সমাজের 'সংস্কৃতি' মৌলিক কারণেই এক নয়, ভিন্ন। আবার শ্রেণিভেদ সম্পন্ন দাস বা সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কৃতি বলতে এক অখণ্ড সৃষ্টি বোঝায় না; স্থান-কাল-পাত্র ভেদে একদিকে যেমন শ্রেণিভেদ-সম্পন্ন এই তিন সমাজের (দাস, সামন্ত ও পুঁজিবাদী) সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য ও বিরোধ থাকবে আবার একই সমাজের মধ্যেও তা প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন, দাসযুগের শুরুর দিকের সংস্কৃতি আর আধুনিক দাস যুগের সংস্কৃতিতে মূলত সময়ের কারণে পার্থক্য দেখা যায়; আবার পুঁজিবাদে পুঁজির আদিম সঞ্চয়ন যুগের সংস্কৃতি, শিল্প বিপ্লব যুগের সংস্কৃতি, পুঁজিবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণ পরবর্তী সংস্কৃতি (যাকে অনেকেই "কর্পোরেট কালচার" বলেন) এবং আধুনিক সন্ত্রাসবাদী বিশ্বপ্রভুত্বের যুগের সংস্কৃতি এক নয়— বৈচিত্র্য আছে, আছে বিরোধের নতুন ধরণ, আছে প্রকাশের নতুন মাত্রা। শ্রেণিভেদ-সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থাদির বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক সমাজে (যা তত্ত্বগতভাবে শ্রেণি-বৈষম্যহীন সাম্যবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর; এবং যে সমাজ বিনির্মাণ প্রয়াস মানব ইতিহাসের এক মহা-প্রায়োগিক পরীক্ষা; "great experiment অর্থে) উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিপরীতে থাকে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী মালিকানা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমাদের সংবিধানে "মালিকানার নীতি"সংশ্লিষ্ট ১৩ অনুচ্ছেদে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী মালিকানার গুরুত্বের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং সে কারণেই মানুষকে শোষক এবং শোষিত হিসাবে বিভক্তির সুযোগ থাকে না। এ সুযোগ শুধু তখনই সৃষ্টি হয় যখন উৎপাদককে উৎপাদনের উপায় জঙ্গি— জমি-জলা, যন্ত্রপাতি, কলকারখানার মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় (ঐতিহাসিকভাবে এ কাজটা শুরু হয়েছিল কৃষিতে শ্রমদাতা প্রকৃত কৃষককে কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ আর বিচ্ছিন্ন করা দিয়ে)। আর এসব কারণেই সমাজতান্ত্রিক সমাজের সাংস্কৃতিতে মৌল কোনো আর্থিক সংঘাত থাকার যৌক্তিক কারণ নেই, তবে সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকবেই কারণ যে কোন দেশই একক নয় বহু জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষাভাষি মানুষের সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজের মত বিরোধমূলক হবার কারণ নেই; বিরোধাত্বক বৈচিত্র্যের জায়গায় মানুষের সৃজনশীলতা প্রকাশের প্রভাবক হিসেবে বৈচিত্র্যপূর্ণ পথ-পদ্ধতি থাকার কথা।

তৃতীয়ত: "বিচারহীনতার সংস্কৃতি", "ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ (অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক)", "যুদ্ধাপরাধ", "মানুষ পুড়িয়ে মারার রাজনৈতিক (!) ষড়যন্ত্র ও তদনুরূপ সংস্কৃতি" (যেখানে মরে গরীব মানুষ ও দুর্বল মানুষ), "অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন", "রেন্ট সিকার লুটেরা-পরজীবী-আগ্রাসীদের সর্বময় কর্তৃত্ব-আধিপত্য", "দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা", "সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বপ্রভুত্ব", "মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা", "মানব মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতা "— এ সবের কোনোটিই বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, পরস্পর সম্পর্কিত— যোগসূত্রসম্পন্ন অবিচ্ছেদ্য বিষয়াদি। এক্ষেত্রে আমার ধারণা মতে আমাদের প্রাথমিক কাজ এসব প্রতিটি বিষয়কে যেমন ভিন্ন ভিন্নভাবে বিষয়ের সারবস্তু-কার্যকারণ সম্পর্ক অনুসন্ধানপূর্বক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা তেমনি প্রতিটি বিষয়কে বৃহৎ পর্দায় (বৈশ্বিক পর্দায়, প্রকৃতির বিধি-বিধানের পর্দায়) বৃহৎবর্গের অধীনস্থ প্রক্রিয়া ও বিষয় হিসেবে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করে উপসংহারে উপনীত হওয়া। আমি এ কাজটি শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি উহ্য রেখে করিনি, শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করেছি।

চতুর্থত: একথা কেউ কেউ বলেন যে, অনেক হয়েছে এসব বিশ্লেষণ। এখন পরিবর্তন সাধনের পালা। আমি প্রথম অংশের (অর্থাৎ "অনেক হয়েছে বিশ্লেষণ") সাথে আদৌ একমত নই। আর সঙ্গত কারণেই দ্বিতীয় অংশের সাথে দ্বিমত পোষণ করি– বিশ্লেষণেই যদি ঘাটতি থাকে এবং তা সঠিক না হয় তাহলে কিসের পরিবর্তন করবেন? কারণ কোথায় সেসব বিশ্লেষণ? সুশীল সমাজ শ্রেণি আর বুদ্ধিজীবী শ্রেণি এসব নিয়ে দ্বিবিধ কাজ (গবেষণা?) করেছেন। তারা প্রথম যে কাজটি করেছেন তা হলো তথাকথিত নির্মোহতার মোড়কে প্রচলিত কোনো না কোনো তত্ত্ব-অনুসিদ্ধান্ত-ধারণা (theory, hypothesis, concept) অবলম্বনে এসব কিছু "শ্রেণি নিরপেক্ষ অবস্থান"(!) থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন যা প্রকৃত অর্থে আদৌ শ্রেণি নিরপেক্ষ নয়— শ্রেণি স্বার্থীয়, নির্ভেজাল শ্রেণিস্বার্থের বিষয়— সমাজের নিয়ামক শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী বিষয়। আর দ্বিতীয় যে কাজটি তারা করেছেন তা হলো বিজ্ঞানসম্মত নয় এমন বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে অযৌক্তিক এমন সব উপসংহারভিত্তিক সুপারিশ উত্থাপন করেছেন যা প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন করলে ঘুরে ফিরে সমাজ-রাষ্ট্র আবারও আদি জায়গায় ফিরে

যাবে এবং ফিরে যাবে অতীতের তুলনায় আরো বেশি (অপ) শক্তি নিয়ে। প্রকৃত অর্থে ঐসব 'সুশীল শ্রেণি' ও 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণি'র উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ শতকের ফরাসি মুক্ত-বুদ্ধি পথিকৃৎ দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাক রুশোর ভাষায় বলতে হয় "সুশীল সমাজের ওরা দুর্বলের উপর ধনীদের লুণ্ঠন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার গ্যারান্টি প্রদানকারী ষড়যন্ত্রের এজেন্ট মাত্র"। অথবা বিংশ শতকের প্রথমার্ধের ইতালিয়ান রাজনৈতিক-দার্শনিক এন্থেনিও গ্রামসির ভাষ্যে বলতে হয় "রাজনৈতিক সমাজের বাইরে আরো একটি সমাজ আছে যার নাম সুশীল সমাজ। সুশীল সমাজ হল সমাজে ঐকমত্য সৃষ্টিকারী মৌল (বা উপাদান) যা সমাজের নিয়ামক শ্রেণির কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায়ে অবদান রাখে।" প্রচলিত 'সুশীল সমাজ শ্রেণি' ও গতানুগতিক 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণির' পথ আর আমার পথ এক নয়। আমার পথটি সম্পূর্ণ উল্টো, সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর। সে কারণে আমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-উপসংহার-সুপারিশের সাথে ওসব প্রচলিত গতানুগতিক মতের কোনো ধরনের মিল হবে না। মিল হবে না করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও।

পঞ্চমত: আজকাল 'বিশ্বাস' (faith অর্থে) এবং "মতামত" (opinion অর্থে) নিয়ে বেশ "তর্ক-সংলাপ-আলোচনা" (debate-dialogue-discussion) হচ্ছে। আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে সভা-সমিতিসহ প্রচার মাধ্যমে। টেলিভিশনের 'টক শো', সংবাদপত্রের খবরাখবর, বিভিন্ন ধরনের লিফলেট-বুকলেট-বিলবোর্ডসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার ঠেলায় বলা চলে দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠি— সাধারণ মানুষ— বেশ কিংকর্তব্যবিমুঢ়। কারণ বক্তব্য-বিবৃতি-খবরা-খবরের সত্য-মিথ্যা ভাল-মন্দ যাচাই এখন অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় জটিল রূপ নিয়েছে। একই সাথে মানুষ সম্ভবত কাউকেই বিশ্বাস করছেন বলে মনে হয় না। এক্ষেত্রে আসলে অবস্থাটা কি? জ্ঞানী(!) বক্তব্য বাগিশরা(!)"যেমন খুশি তেমন সাজো" আলখেল্লায় যা বলছেন তা থেকে দুটো ধারা স্পষ্ট। কেউ বলছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"; আবার বিজ্ঞান-বন্ধু-প্রগতিবাদী (!) সেজে কেউ কেউ বলছেন "তর্কে মিলায় বস্তু বিশ্বাসে বহুদূর"। আমি ওদের কোন দলেরই সদস্য নই। তবে কেউ যদি প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম-বিধি-সূত্রে বিশ্বাসের কথা বলেন সেক্ষেত্রে আমি তার বিশ্বাসের সাথে অবশ্যই একমত হবো। কিন্তু কেউ যদি বলেন যে, ডিক চেনি-রোনোল্ডর‍্যামসফেল্ড-কলিনপাওয়েলের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বপ্রভুত্ব নিশ্চিতকরণের মহাকৌশল (Grand Strategy) যেখানে বলা হচ্ছে "আমরা ফেরেস্তা-শান্তির দূত আর ওরা (আমাদের উদ্দেশ্যে) শয়তান"— এটাই সঠিক— সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চিতভাবেই ঐ বিশ্বাসের সাথে কোনো কালক্ষেপণ না করেই দ্বিমত পোষণ করবো; কারণ আমার বিশ্বাস ঠিক উল্টোটা। আমি যুক্তি-তর্কে (সংলাপসহ) বিশ্বাসী— প্রলাপ-বিলাপে নই। তাই এখন যদি কেউ বলেন আসুন তর্ক করি এ উপসংহারে উপণীত হতে যে "যুদ্ধাপরাধী ও তাদের মৌলবাদ সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্ব — কোন অপরাধ নয়" অথবা "জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার যুক্তি নেই" অথবা "আদিবাসী মানুষ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের জমি জমা জোর দখল করে ঠিক কাজই করা হয়েছে"— আমি এসব প্রকৃতির বিধি বিরুদ্ধ, নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত, অযৌক্তিক সময়ক্ষেপণকারী, '১২ হাত কাঁকড়ের ১৩ হাত বিচি' ধরণের তর্কের মধ্যে নেই। সুতরাং 'বিশ্বাস' ও 'মতামত' নিয়ে তর্ক উভয়ই প্রয়োজন অথবা কোনটারই প্রয়োজন নেই— সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের অন্তর্নিহিত যৌক্তিকতার উপর।

ষষ্ঠত: আমার সুপারিশমূলক বক্তব্যসমূহ যেহেতু আমার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকেই উদ্ভূত সেহেতু নীতি-নির্দ্ধারকদের (?) "অপ্রয়োজনীয় সুবিধার" জন্য (এখন যে ধারা প্রচলিত ও "স্বীকৃত"; লেখনিতে সুপারিশ-এর অবস্থান নিয়ে ওদের সুবিধে-অসুবিধে ওরাই ভাবুক!) প্রবন্ধের শেষে ভিন্নভাবে কোন সুপারিশ দেই নি— তবে প্রবন্ধের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত উপসংহারিক বক্তব্য আছে। প্রবন্ধের কাঠামো বিনির্মাণে এ আমার সচেতন সিদ্ধান্ত। কারণ সুপারিশ তো জটিল নয়—সোজা সাপ্টা: (১) "বিচারহীনতার সংস্কৃতি"— বাস্তবতা; এ সংস্কৃতি পাল্টাতে হবে; এ সংস্কৃতি উল্টাতে হবে"। প্রচলিত বিচারহীনতার এ সংস্কৃতি উল্টাতে হলে-পাল্টাতে হলে লুণ্ঠনকারী রেন্ট সিকারদেরকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা, রাজনীতি ও সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। তবে বিষয়টি সাধারণ কোন্ সংস্কারের (reform অর্থে) বিষয় নয়; বিষয়টি শেষ বিচারে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট। (২) "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ"— সংবিধানের এ বিধান (অনুচ্ছেদ ৭.১) বাস্তবে রূপ দিতে হবে। প্রজাতন্ত্রের মালিক যে জনগণ সেই জনগণই যখন আর মালিক না হয়ে প্রজায় রূপান্তরিত হয় আর মালিক হয়ে যায় তারা যারা জনগণের সেবক হবার কথা— এহেন অবস্থায় সংবিধানের এ বিধান কার্যত শ্লোগান সর্বস্ব। তাই সংবিধানের এ বিধান নিশ্চিত করাটাও দুঃসাধ্য অথবা বর্তমান আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোতে অসম্ভব প্রস্তাবনা। (৩) ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডসহ ১৯৭১-এর মহান

মুক্তিযুদ্ধে স্বনামে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাসহ মুক্তিকামী মানুষ হত্যাকারী রাজনৈতিক দল জামায়াত-ইসলামের রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে; ধর্মকে রাজনীতিতে আনা যাবে না; "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"— এসবই তো ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্তত "ধর্মনিরপেক্ষতা" নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে প্রগতিবাদী এসবই পবিত্র সংবিধান থেকে কার্যত উচ্ছেদিত হয়ে তার জায়গায় "বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম"সহ "ইসলামকে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের মালিক যেখানে জনগণ এবং যেখানে ঐ জনগণ বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠির মানুষ সেখানে নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম কিভাবে প্রজাতন্ত্রের ধর্ম হয়? এ এক মহা গোঁজামিল! সংবিধানকে এসব গোঁজামিল থেকে মুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন সাধন করতে হবে। অন্যথায় সংবিধানের মূল নীতি— চারটি স্তম্ভকে সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে; বাদ দিতে হবে "জনগণই প্রজাতন্ত্রের মালিক" অনুচ্ছেদ। (৪) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কার্যক্রমে আরো অনেক বেশি গতি সঞ্চার করতে হবে— ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়িয়ে, আপিল বিভাগে পৃথক আপিল বেঞ্চ গঠন করে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে সব দিক দিয়ে আরো অনেক-অনেক বেশি শক্তিশালী করে, এবং বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী লবিস্টদের তোয়াক্কা না করে (৫) মৌলবাদের অর্থনীতির উৎসমূল নির্মূল করতে হবে। অবশ্য এই সুপারিশ যার বা যাদের উদ্দেশ্যে বলছি সে বা তারা কোন দিকে(?); তাদের মুরদ আর নিয়ত নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন আদৌ অমূলক নয়; (৬) মৌলবাদী উগ্রতা ও জঙ্গিবাদ সমূলে ধ্বংস করতে হবে (জনগণের অর্থে পরিচালিত-পরিপুষ্ট ও প্রযুক্তি-জ্ঞানসমৃদ্ধ এতোসব গোয়েন্দা সংস্থা থাকতে ওদের পাওয়া যাচ্ছে না কেন?); (৭) সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পরিবেশ ও শর্ত সৃষ্টি করতে হবে; (৮) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক শক্তি ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিবাদের আন্দোলনকে সর্বাত্মক প্রতিরোধের আন্দোলনে রূপান্তরিত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বৈষম্যহীন-প্রগতিবাদী-অসাম্প্রদায়িক মানুষের সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র বিনির্মাণ করতে হবে। এসবের পরে আর কি কি সুপারিশ বাকি থাকে?

৩। বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: একটি সর্বজনীন রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বের সন্ধানে

"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদ" এসবের উত্থান ও ক্রমবিকাশ নিয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির কোন সাধারণ-সর্বজনীন তত্ত্বের (generalized political-economic theory) কথা আমার জানা নেই। অনেকে অনেক ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু এসবের উৎস সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ সম্পর্ক বিচার-বিশ্লেষণ করে এখনও পর্যন্ত কেউই সমগ্র বিষয়টিকে রাজনৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের নিরিখে সর্বজনীন সূত্রবদ্ধকরণে (general political economy theory) সক্ষম হননি। এ পর্যন্ত আমরা কেউ সূত্রবদ্ধকরণের প্রয়োজনীয় জটিল তত্ত্বিয় কাজটির প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশি উপলব্ধি করিনি। আমরা 'বিচারহীনতাকে' বিচারহীনতার দৃষ্টান্ত আর বহিঃপ্রকাশ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছি; 'সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদকেও' আমরা ওসবের দৈনন্দিন দৃষ্টান্ত আর দৃশ্যমান প্রকাশ দিয়েই বুঝবার চেষ্টা করেছি মাত্র। আসলে এসব নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজটিও কখনও খুব সিরিয়াসভাবে জ্ঞানশাস্ত্রিয় বিধি-বিধান মোতাবেক করা হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে পরে আসছি।

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সর্বজনীন সূত্র উদঘাটন অথবা তত্ত্ব কাঠামো বিনির্মাণের আগে একথা অবশ্যই বলা প্রয়োজন যে দুটি বস্তু বা দুটি ঘটনার মধ্যকার অনিবার্য সম্পর্কই হল কার্যকারণ সম্পর্ক (causal relation)। এক্ষেত্রে ঘটনাদ্বয়ের যেটি আগে সংঘটিত হয় সেটাই "কারণ" এবং যেটা তার ফল হিসেবে পরে ঘটে সেটাই "কার্য"। কার্য-কারণ সম্পর্ক দুটি ঘটনা বা দুটি বস্তুর সম্পর্ক হলেও কার্য ও কারণ হিসাবে সংঘটিত হয় না। আমাদের উপলব্ধির সুবিধার্থে আমরা ঘটনাদ্বয়কে অপরাপর ঘটনা থেকে বিযুক্তভাবে ভাবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আমরা যে ঘটনাকে কার্য বলে অভিহিত করি ঐ ঘটনা একই সময়ে অন্য ঘটনার কারণ এবং যাকে কারণ বলে অভিহিত করি সে অপর ঘটনার কার্য বা ফল হিসাবে সংঘটিত হয়। বস্তুর সমগ্র বিশ্বচরাচর কার্য কারণের সামগ্রিকতার-সামূহিকতার সূত্রে আবদ্ধ। একটি কার্যের সামগ্রিক কারণ তাই একটি নির্দিষ্ট কারণের চেয়ে বৃহত্তর, এবং সে যুক্তিতেই কোন ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ তার সামগ্রিক কারণের ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা সম্ভব। অভিজ্ঞানের বিজ্ঞানটাই হল এই যে ঘটনায়-ঘটনায় অথবা বস্তুতে-বস্তুতে কার্যকারণের সম্পর্ক আমাদের মনের কল্পনার বিষয় নয়; কার্যকারণ সম্পর্ক কোন বস্তু বা ঘটনা নয়, আর তাই এ সম্পর্ক দৃশ্যমান নয়। বিষয়টি সহজবোধ্য। যেমন, আমরা আগুন দেখতে পারি; আমরা ধোঁয়াও দেখতে পারি, কিন্তু আগুন ও ধোঁয়ার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক দেখতে পারি না; আগুন যে ধোঁয়ার কারণ আর ধোঁয়া যে আগুনের কার্য বা ফল এটা আমরা দেখতে পারি না। সুতরাং "বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিস্তৃতি"— কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র

বিনির্মাণে দর্শনের জ্ঞানশাস্ত্রীয় যে বিষয়টি স্বীকার করে এগুতে হবে তা হল: কার্যকারণ সম্পর্ক কোন বস্তু নয়; কার্যকারণ সম্পর্ক মানুষের কল্পনাও নয়; বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা মানুষের কল্পনার বিষয় নয়; আর এ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক।

আমরা খালি চোখে যা দেখি তা যা দেখি তার বাহ্যিক (appearance বা form অর্থে)— রূপ বা অবস্থা মাত্র। সেটা হতে পারে বস্তুর, হতে পারে ঘটনার, হতে পারে প্রকৃতির বাহ্যিক অবস্থা। এসবের কোনটিই আমরা খালি চোখে অথবা ইন্দ্রিয়গতভাবে যা দেখি অথবা আমাদের সামনে এসব যেভাবে উপস্থাপিত হয়, অথবা দৃশ্যমান হয় তা কখনও বিষয়ের (অর্থাৎ বস্তুর, ঘটনার, প্রকৃতির) অন্তর্নিহিত মর্মবস্তু (essence) নয় অথবা আধেয় (content) নয়। এখানেই কারণ-পরিণাম-এর (cause-effect বা causal) অথবা কারণ-উপলক্ষ্য-এর প্রকৃত পার্থক্য। বিষয়টিকে সাধারণ্যে দর্শন শাস্ত্রীয় বলা হলেও বিষয়টি আসলে জ্ঞানশাস্ত্রিয় (epistemological) — যা যে কোনো শাস্ত্রের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এবং শতভাগ প্রযোজ্য। যেমন ধরুন আমাদের আজকের বিষয়ের একাংশ "বিচারহীনতার সংস্কৃতি"। নির্দিষ্ট সমাজে মানুষ যে বিচারহীনতার শিকার হন অর্থাৎ সুবিচার, ন্যায় বিচার, ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হন তার কারণ কি এই যে বিচারিক আইন-কানুনে সমস্যা আছে(?) এবং/অথবা বিচারক বিচার কাজে পারদর্শী নন এবং/অথবা বাদি-বিবাদি (আসামি)-সাক্ষ্য প্রদানকারীরা মিথ্যা কথা বলেন অথবা সত্য গোপন করেন এবং/অথবা বিচারকদের হাতে ন্যায় বিচার প্রদানের ক্ষমতা স্বল্প এবং/অথবা বিচারক ন্যায় বিচার প্রদানে বিব্রতবোধ করেন এবং/অথবা বিচারক অনুরাগ-বিরাগের বশবর্তি হন না? আসলে এসবের কোনটিই মানুষকে সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্য বিচার প্রদানে আসল বাধা নয়। আইনতো যথেষ্ট পরিমাণেই এবং যথেষ্ট দ্রুত কাজ করে যখন গ্রামের গরীব-দুর্বল কৃষক সলিমুদ্দি অথবা যদু দশ হাজার টাকার কৃষি ঋণ নিয়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাকে সার্টিফিকেট মামলায় মাজায় দড়ি বেঁধে দিনে-দুপুরে জনসমক্ষে থানায় নিয়ে জেল খানায় পাঠানো হয়। বিরাট 'ন্যায় বিচার'! কিন্তু যখন কেউ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে সদর্পে নির্বিঘ্নে-নিশ্চিন্তে মুক্ত-স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান— তার (বা তাদের) বিচার হয় কি? হয় না। ওদের বিচার করতে পারবেন না। কারণ প্রকৃত শোষক শ্রেণির আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ওরাই সম্মিলিতভাবে-জোটবদ্ধভাবে যে রেন্ট সিকার গোষ্ঠির সিস্টেম সৃষ্টি করেছে রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি ঐ সিস্টেমেরই অনুগত-অধীনস্থ সত্তা মাত্র। শোষণ উদ্ভূত রেন্ট সিকিং-এর ঐ সিস্টেমটি কিন্তু দৃশ্যমান নয়, দৃশ্যমান শুধু বিচারহীনতা। সুতরাং কারণ পরিণাম গুলিয়ে ফেললে সময়ক্ষেপণকারী বক্তাবাজীর বাইরে বেরুনো সম্ভব হবে না।

"বিচারহীনতা"-র কার্যকারণ অথবা কারণ-পরিণাম অথবা কারণ-উপলক্ষ্য নিয়ে যা বললাম সারগতভাবে একই ধারণা প্রযোজ্য 'মৌলবাদ', 'সাম্প্রদায়িকতা', 'মৌলবাদী জঙ্গিত্ব' থেকে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষ হত্যা পর্যন্ত— এক কথায় সবকিছুই। কিছু মানুষ সিদ্ধান্ত নিলো যে আমরা ধর্মের পতাকা সমুন্নত রাখবো এবং প্রয়োজনে ধর্মযুদ্ধ করবো, ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে জিহাদ করবো, মানুষ মারবো— এসবের কোনটিই সাম্প্রদায়িকতা অথবা মৌলবাদ অথবা মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উত্থান ও বিস্তৃতির আসল কারণ নয়। এসব ওসবের দৃশ্যমান বাহ্যিক রূপ মাত্র। ওসবের কারণ অনেক গভীরে। আগেই বলেছি কার্য-কারণ সম্পর্ক কোন বস্তু নয়, তা আমাদের কল্পনাও নয়; কার্যকারণ সম্পর্ক বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভূত এবং সমগ্রকতা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘটনা আমাদের কল্পনার বিষয় নয়। কারণ অনুসন্ধান করতে হলে একদিকে যেমন দাস যুগ থেকে সামন্তযুগ হয়ে আধুনিক পুঁজিবাদ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর বিশ্বপ্রভুত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতির শেকড়ে যেতে হবে আর অন্যদিকে স্থানিক থেকে বিশ্বযুদ্ধ হয়ে মহাকাশের সামরিকীকরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নির্মোহ ইতিহাস জানতে হবে যার শেকড়ও রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়। আর শেকড়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির সেই ইতিহাস স্পষ্ট বলবে যে স্থানিক থেকে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রসমূহের জোট আর রাষ্ট্রসমূহের জোট থেকে বিশ্বপ্রভুত্বের বাসনাকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-মতাদর্শিক যুদ্ধের প্রকৃত কারণ— শোষণ; আরো শোষণ; এমনকি তেমন কোনো কিছু বৈষয়িক উৎপাদন না করেই 'বুদ্ধি' দিয়ে 'শক্তি' দিয়ে শোষণ। অনুসন্ধানের বিষয়ের রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র উদ্ভাবনে সম্ভবত আরো পেছনে আরো গভীরে যাওয়া দরকার। কারণ একদিকে শোষণ উদ্ভূত দারিদ্র্য-বৈষম্য-বঞ্চনা-অসমতা আর অন্যদিকে কিছু মানুষের হাতে প্রকৃতির বিধি বিরুদ্ধ অঢেল সম্পত্তির কার্য-কারণ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের মন-মননকে পৌরাণিক কাহিনীর দাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আমরা, এমনকি যাদেরকে আমরা আলোকিত মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেই তাদের অনেকেই বলেন "মানুষ গরীব কারণ সে গরীব", "মানুষ গরীব কারণ পরিশ্রমী নয়", "মানুষ গরীব কারণ সে মিতব্যয়ী নয়", "মানুষ গরীব কারণ সে বুদ্ধিমান নয়", "মানুষ গরীব কারণ সে অলস", "মানুষ গরীব কারণ সে উশৃঙ্খল", "মানুষ গরীব কারণ তার জ্ঞান-বুদ্ধি কম"

ইত্যাদি— মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করার হরেক রকম অনৈতিক ও সর্বৈব মিথ্যা গরীবি তত্ত্ব। গরীবের গরীব হওয়া আর ধনীর ধনী হওয়ার পেছনে আমাদের এক আদি পাপের কাহিনী(!) শোনানো হয়। পৌরাণিক আদি পাপের কাহিনীটি এরকম: "আদম আপেল খেয়েছিল বলেই মনুষ্য জাতির উপর পাপের বোঝা নেমেছিল। এর উদ্ভব ব্যাখ্যা করা হল বলে ধরা হয় যখন এটিকে পুরাকালের একটি কাহিনী হিসেবে বলা হয়। বহুকাল পূর্বে দুই ধরনের মানুষ ছিল: এক শ্রেণিতে ছিল পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান এবং সর্বোপরি, মিতব্যয়ী উপর মহলের বাছাই লোকেরা; অন্য শ্রেণিতে ছিল অলস ধূর্তের দল, যারা তাদের সর্বস্ব খুইয়ে উশৃঙ্খল জীবন-যাপন করতো। ধর্মতত্ত্বে আদি পাপের কাহিনী থেকে আমরা অবশ্যই জানতে পারি কোন শাস্তির ফলে মানুষকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নের সংস্থান করতে হয়; কিন্তু অর্থনৈতিক আদি পাপের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে, কিছু লোকের ক্ষেত্রে তা কোনো মতেই আবশ্যিক নয়। তা সে যাই হোক! মোদ্দা কথা, দেখা গেল যে প্রথম শ্রেণির লোকেরা ধন সঞ্চয় করল এবং দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেদের শেষ পর্যন্ত নিজের গায়ের চামড়া ছাড়া আর কিছুই বিক্রয় করবার মতো অবশিষ্ট থাকলো না। আর এই আদি পাপের সময় থেকেই শুরু হলো বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দারিদ্র্য, প্রচুর পরিশ্রম সত্ত্বেও যাদের নিজেকে ছাড়া আর কিছুই বিক্রয় করবার রইলো না, আর মুষ্টিমেয় লোকের ধন সম্পত্তি ক্রমাগত বেড়েই চলল যদিও বহু পূর্বেই তারা কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে। সম্পত্তি সংরক্ষণের অজুহাতে এই ধরনের জোলো, ছেলেমানুষী ধর্মোপদেশ আমাদের প্রতিদিন শুনতে হচ্ছে।... বস্তুতপক্ষে আদিম সঞ্চয়নের পদ্ধতিগুলি আর যাই হোক, "নির্দোষ রাখালিয়া কাব্যধর্মী নয়" (কার্ল মার্কস এসব লিখেছেন ১৮৬৬ সালে যার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হয়েছে ১৯৮৮ সালে; দেখুন, পুঁজি, খণ্ড ১, প্রথম পর্ব, পৃ: ২৬১-২৬২, মস্কো: প্রগতি প্রকাশন)। আসলে মূল্যহীন আমার এসব কথাবার্তা শুনতে ভাল লাগলেও লাগতে পারে তবে এসব দিয়ে বিচারহীনতা ও মৌলবাদ সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব (সাধারণ সূত্র) বিনির্মাণ সম্ভব নয়। অসার ভাবনা আরেকটি অসার ভাবনার জন্ম দেয়: আর তা চলতে থাকলে অসার ভাবনার সম্প্রসারিত পুনরুৎপাদন চলতে থাকে। যুক্তিযুক্তভাবেই এখন আসা যেতে পারে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিনির্মাণের প্রসঙ্গে।

বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, দুর্বৃত্তায়ন (অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক), কুশাসন, অপশাসন, দুঃশাসন, স্বৈরশাসন, ঘুষ, দুর্নীতি, দারিদ্র্য, বৈষম্য, অসমতা— এসবের কোনটিই একটি অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন (isolated), খণ্ডিত (fragmented) ও কামরাভুক্ত (compartmentalised) কোনো বিষয় নয়। এসবের প্রত্যেকটিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয় (category বা ধারণা অর্থে) হিসেবে ধরি তাহলে প্রত্যেকে একে অন্যের সাথে সম্পর্কিত। এখানে রাজনৈতিক অর্থনীতির যে তত্ত্ব কাঠামো বিনির্মাণের প্রয়াস নিয়েছি সেখানে মূল কথা হলো এসব প্রত্যয়ের যে কোনো একটি অন্যটির দৃশ্যত কারণ হিসেবে মনে হলেও শেষ বিচারে প্রকৃত অর্থে তা কারণ নয়— কারণ সদৃশ। যেমন প্রায়শই মনে করা হয় যে "দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"ই "ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের" উত্থান ও বিস্তৃতির প্রধান কারণ। আসলে এটা ঠিক নয়, উল্টোটা তো নয়ই। ইতোপূর্বে আগুন আর ধোঁয়ার মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলেছি সে নিরিখে এসব প্রত্যয় আসলে ধোঁয়া– অর্থাৎ কারণ নয়, কারণের ফল, যেখানে আগুন হলো কারণ। তাহলে এক্ষেত্রে যৌক্তিক প্রশ্ন—"দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা"র কারণ কি? শেষ বিচারে ঐ কারণটিই হবে বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বসহ উল্লিখিত সকল প্রত্যয় সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উদ্ভব, বিকাশ, বিস্তৃতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রধান নির্ণায়ক— প্রধান কারণ। আমার মতে এই প্রধান নির্ণায়ক বা নিয়ামক কারণটি হলো শোষণ— শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী মুক্তবাজার কাঠামো। আর এই শোষণ প্রক্রিয়া প্রধানত দেশজ হলেও তা আর দেশজ সীমানায় আবদ্ধ নয়, আন্তর্জাতিক। সাম্রাজ্যবাদী (মার্কিন) বিশ্বপ্রভুত্ব একদিকে যেমন এই শোষণ (অর্থাৎ কারণ) আর অন্যদিকে এই শোষণ উদ্ভূত পরিণাম বা প্রতিফলে (অর্থাৎ কার্য) শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। সুতরাং, শেষ বিচারে শোষণ (exploitation অথবা অন্যের সৃষ্ট সম্পদকে আত্মসাৎ করা এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা) এবং এই শোষণের সম্প্রসারণই সমাজে বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উদ্ভব ও বিকাশ-বিস্তৃতির শেকড়ের কারণ। সম্পূর্ণ এই প্রক্রিয়াটি যেভাবে কাজ করে তা হলো এরকম: সমাজে (১) পুঁজিপতি-রেন্ট সিকাররা অর্থপুঁজি-বিত্তপুঁজি-ক্ষমতাপুঁজি-প্রভাবপুঁজি বিনিয়োগ করে। (২) উদ্দেশ্য বিনিয়োজিত পুঁজির ফল (উদ্বৃত্ত) আত্মসাৎ করে (অর্থাৎ শোষণ করে) সংশ্লিষ্ট সকল ধরনের পুঁজি সম্প্রসারিত করা এবং যে কোনো মূল্যে শোষণ ব্যবস্থাকে স্ব-প্রসারমান রাখা। এখানে পুঁজির স্ব-প্রসারণ বা স্ব-সম্প্রসারণ ঘটে যার ফলে পুঁজির মালিক আগের চেয়ে শক্তিধর হয়ে ওঠে। (৩) এসব পুঁজি বিনিয়োগ করা হয় সমাজের উপরি কাঠামোর সকল মতাদর্শ থেকে শুরু করে মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠানে (যেমন রাষ্ট্রের আইনসভা, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ থেকে শুরু করে সকল মতাদর্শগত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে)। এ প্রক্রিয়া কোনো পর্যায়ে থেমে থাকে না— অব্যাহতভাবে চলে। এ প্রক্রিয়া নানা পর্যায় অতিক্রমকারী এক নিরন্তর বিচলন বা সঞ্চালন (circulation) প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া থেমে গেলে শোষণ উদ্ভূত প্রতিফল অর্থাৎ বিচারহীনতা,

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, জঙ্গিত্ব এ সব কিছু থেমে যাবে, নিস্ক্রীয় হয়ে যাবে; আর এ প্রক্রিয়ার গতি হ্রাস পেলে প্রতিফল বা পরিণামের গতিও হ্রাস পাবে এবং তা ধীরে ধীরে নির্জীব-নিস্তেজ হয়ে পড়বে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যেভাবে ঘটে তা সূত্রায়িত করলে যা দাঁড়ায় সেটা কার্ল মার্কসের "পুঁজির সাধারণ সূত্রস্থ পুঁজির বর্তনী ও আবর্তনের" মত যার সাথে এই প্রবন্ধ-সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারিত রূপ পরে দেখানো হচ্ছে।

পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সব পদের পাগল পাওয়া যেতে পারে একটি পদ ছাড়া। যে পদের পাগল একটিও পাওয়া যাবে না যে নিয়মিতভাবে (as a general rule) পুঁজি হিসেবে যত টাকা বিনিয়োগ করেন (ধরুন ১ কোটি টাকা) বিনিয়োগ ফল হিসেবে ঠিক তত টাকায় (অর্থাৎ ঐ ১ কোটি টাকা) ফেরত পেতে চান। সাধারণ যুক্তিই বলে তিনি ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করলে বিনিয়োগ ফল হিসেবে ১ কোটি টাকার বেশী (অবশ্যই সমানও নয় কমও নয়) পেতে চাইবেন। এই বেশিটা তিনি কিভাবে পাবেন, কোথায় পাবেন, কি করলে পাবেন? এটা পেতে হলে পুঁজি হিসেবে তিনি যে অর্থ ব্যয় করলেন ঐ অর্থ দিয়ে তাকে এমন কিছু পণ্য কিনতে হবে যে পণ্য নিজের মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে ধরুন শিল্প পুঁজির মালিক। তিনি প্রথমে অর্থ নিয়ে ক্রেতা হিসেবে বাজারে আসবেন; কিনবেন শ্রমশক্তি (সাধারণভাবে বলা হয় শ্রমিক) এবং উৎপাদনী-যন্ত্রপাতিসহ উৎপাদনের কাঁচামাল। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের এমন কোন নিজস্ব গুণ বৈশিষ্ট্য নেই যে তাদের যা মূল্য তারা নিজেরা তার চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম, তারা যা পারে তা হল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কাঁচামালের রূপান্তর সাধন যেখানে রূপ পরিবর্তন হয় কিন্তু মূল্য পরিবর্তন হয় না (বা বাড়ে-কমে না)। এক্ষেত্রে একমাত্র পণ্য যা কিনলে মূল্য বাড়ে তা হল শ্রমশক্তি যে নিজের মূল্যের চেয়ে (অর্থাৎ মজুরির চেয়ে) বেশি মূল্য সৃষ্টি করতে সক্ষম। কিন্তু এ অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় উৎপাদনে কিন্তু তা উসুল (realize) হয় বাজারে ঠিক তখন যখন পুঁজিপতি তার উৎপাদিত পণ্য (যার মূল্য লুক্কায়িত আছে শোষণ নিমিত্ত উদ্বৃত্ত মূল্যে) বাজারে আনবেন বিক্রেতা হিসেবে। এরপর আবারও সে বাজারে আসবে ক্রেতা হিসেবে এবং ক্রেতা বিক্রেতা ক্রেতা বিক্রেতা... এ প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। অতএব প্রথমে সে ক্রেতা পরে বিক্রেতা তারপরে আবারও ক্রেতা। অর্থাৎ প্রথমে সে ক্রেতা হিসেবে তার অর্থপুঁজিকে উৎপাদনশীল পুঁজিতে রূপান্তরিত করবেন (এটাকে বলা হয় পুঁজির চক্রাবর্তনের প্রথম পর্যায়); তারপরে উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপাদনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের যে মূল্য উৎপন্ন পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় শ্রমিকরা নিজ শ্রমে তার রূপান্তর ঘটায় এবং নতুন মূল্য সৃষ্টি করে যার মধ্যে থাকে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদিত মূল্য ও উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজির চক্রাবর্তনের দ্বিতীয় এ পর্যায়ে প্রথম পর্যায়ের উৎপাদনশীল পুঁজি পণ্য পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে। এরপরে পুঁজির চক্রাবর্তনের তৃতীয় পর্যায়ে পুঁজিপতি ক্রেতা হিসেবে নয় বিক্রেতা হিসেবে তার পণ্য বাজারে বিক্রি করে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি হয়েছে তা উসুল (realize) করবেন। এক্ষেত্রে চক্রাবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পণ্য পুঁজি আবারও প্রথম পর্যায়ের অর্থ-পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে। তবে শেষোক্ত এই অর্থের মধ্যে থাকবে উদ্বৃত্ত মূল্য যা পুঁজিপতি আত্মসাৎ করবেন সেটাই শোষণ— যে শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাটাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্য। নিরবচ্ছিন্ন এই শোষণ প্রক্রিয়া সমাজের নীচতলায় দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধিসহ বিচ্ছিন্নতা বাড়ায় আর উঁচুতলায় বিত্ত-বৈভব-সম্পদ-সম্পত্তি বাড়ায়, জাতীয় সম্পদ ও জাতীয় আয়ে সমাজের নীচু তলার মানুষের হিস্যা কমায় আর উঁচু তলার হিস্যা দ্রুতগতিতে বাড়ায়, আর একই সাথে এই প্রক্রিয়ায় জন্ম নেয় পুঁজিবাদে সংকটের সকল রূপ (যে সব রূপ বাণিজ্যচক্র অর্থাৎ business cycleসহ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয়)। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় পুঁজির সাধারণ চক্রাবর্তন সূত্রটি হবে নিম্নরূপ:

অর্থ → পণ্য → আরো বেশি অর্থ

এইই যদি পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থার সারসূত্র হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে শেষ বিচারে শোষণ ব্যবস্থা কি ভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বের উদ্ভব-উত্থান, বিকাশ ও বিস্তৃতির মূল কারণ হতে পারে? সেক্ষেত্রে উল্লেখিত রাজনৈতিক অর্থনীতির রূপান্তরিত সূত্রটিই বা কেমন হতে পারে? এ সম্পর্কে আমার প্রস্তাবিত সূত্র উত্থাপনের আগে আরো কিছু যুক্তির কথা বলা প্রয়োজন। এমন কি হতে পারে যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা শোষণ ভিত্তিক কিন্তু সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার বিদ্যমান? কেউ হয়তো বলবেন হতে পারে (এটা সম্ভব) এবং উদাহরণ হিসেবে স্কান্ডিনেভিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্রাট শাসিত দেশ থেকে শুরু করে আধুনিক যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলবেন। এ ধারণা বড় মাপের ভ্রান্তি। তা না হলে এখন জোসেফ স্টিগলিজকে কেনো "The Price of Inequality", পল ক্রগম্যানকে কেন "End this Depression Now", থমাস পিকেটিকে "Capital in the Twenty-First Century" এবং নোয়াম চমস্কিকে "The Failed State" গ্রন্থ রচনা

করে পুঁজিবাদের রূপান্তরের কথা বলতে হয় (অথচ এদের কেউই সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা নন)? উন্নত পুঁজিবাদী ঐ সব দেশে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ ব্যক্তি পর্যায়েও অনেক ধরণের ন্যায্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় থেকে বঞ্চিত, আর বৃহত্তর পর্যায়ে ঐ সব দেশের রাষ্ট্র-সরকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব প্রভুর ইরাক দখল থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রকৃতি বিরুদ্ধ অপকর্মের সাথে হয় সরাসরি জড়িত এবং/অথবা জাতিসংঘসহ বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আর্ন্তজাতিক মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ(!) সংস্থায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে দুর্বলদের বিরুদ্ধে সবল অবস্থান গ্রহণ করে। তাহলে শোষণভিত্তিক সমাজে— তা একক কোন দেশ ভিত্তিক হোক অথবা সমষ্টিবদ্ধ জোট হোক— বিচারহীনতা থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা তো স্বাভাবিক বিষয়ই হবার কথা, হবার কথা সাধারণ সূত্রীয় বিষয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে ব্যক্তি— সামাজিক জীব, সমাজবদ্ধ, রবিনসন ক্রুশোর মত কোন দ্বীপের একক বাসিন্দা নয়।

আমি প্রস্তাবিত সূত্র উথাপনের আগে আরো একটু স্পষ্ট করে বলতে চাই যে "শোষণ অধিকার" সমীকরণে 'শোষণ' হল কারণ (cause) আর 'অধিকার' হলো পরিণাম, শোষণ উদ্ভূত যে পরিণামে থাকবে 'সবলের অধিকার' আর 'দুর্বলের অধিকারহীনতা'। আবার সমীকরণটা যখন "অধিকার শোষণ" তখন অধিকার কারণ হিসেবে দৃশ্যমান আর 'শোষণ' পরিণাম হিসেবে দৃশ্যমান। এ সব হল কারণ-পরিণামের বাহ্যিকতা—দৃশ্যমান রূপ। আসলে কিন্তু শেষ বিচারে কারণ হিসেবে দৃশ্যমান 'অধিকারের' কারণ হলো 'শোষণ'। আর তাই প্রকৃত সূত্র না বুঝে "শোষণ প্রসঙ্গকে নিয়ামক না মেনে" কেউ যদি বলেন দেশ থেকে অবিচার-বিচারহীনতা-সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মীয় মৌলবাদ-জঙ্গিত্ব-দুর্নীতি-অপশাসন এসব দূর করতে পারলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে— সেক্ষেত্রে আমি বলবো তিনি আসলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের রাজনৈতিক-অর্থনীতির কিছুই বোঝেন নি অথবা বুঝতে চান না অথবা বুঝলে অসুবিধা হবে অথবা এসবের একাধিক (সেক্ষেত্রে তার বোধের এবং/অথবা সৎ সাহসের দৈন্যতায় দুঃখ করা ছাড়া আমার কিছুই করার নেই; তাকে হেদায়েত করা আমার কাজ নয়)। শোষণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গ এড়িয়ে এরকমটিই বলেন "সুশীল সমাজ শ্রেণি" ও "বুদ্ধিজীবী শ্রেণি"-র স্তাবক-চাটুকার-দালাল গোষ্ঠি যারা আমার বিচারে সাম্রাজ্যবাদী মহাপ্রভুদের মতাদর্শিক আজ্ঞাবাহি। যে কারণে তারা শেকড়ের বিষয় এড়িয়ে গিয়ে বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি জাতীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বায়বীয় পদার্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন; আর এসবে মদদ দিয়ে জনগণের চেতনায়ন প্রক্রিয়াকে দিকভ্রষ্ট করতে যথেচ্ছা ব্যবহার করেন গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সকল প্রচার-সম্প্রচার যন্ত্র (এটাই আবার গণ মাধ্যম আর প্রচার-সম্প্রচার মাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতির মুখ্যরূপ)। এখানে আরো উল্লেখ্য শোষণ যখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নেয় তখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশে অধিকারহীনতা ও বিচারহীনতাও একক দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ নেয় অর্থাৎ তা আন্তর্জাতিক-বৈশ্বিক শোষণ ব্যবস্থার অধীনস্থ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যে বিশ্বব্যাপি "ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার-সুবিচার-সার্বভৌমত্ব রক্ষার বিচার-মুক্ত ও স্বাধীন সত্তায় অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার" বিরোধী অবস্থান (যা ডিকচেনি-রোনাল্ড র‍্যামসফেল্ড-কলিন পাওয়াল প্রণীত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়িত গ্রান্ড-স্ট্রাটেজি উদ্ভূত) বিষয়টি আপাতত মুসলিম অধ্যুষিত তেল ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে দৃশ্যমান হলেও এ কথা মনে করার কোনই যুক্তি থাকতে পারে না যে ভবিষ্যতে অবস্থাটা ভৌগোলিক ভাবে এসব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখানে আসলে ধর্ম কোন **কারণগত** বিষয় নয়। মূল বিষয় শোষণ, বিশ্বপ্রভুদের বৈশ্বিক শোষণ আমরা যার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। মূল বিষয় বিশ্বপ্রভুর সাম্রাজ্যবিস্তার ও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা এবং ঐ আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। এ ক্ষেত্রে ৯/১১ কে "সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" (War on Terrorism) নামে ব্যবহার বিশ্বব্যাপি ভয়ভীতি সৃষ্টি ও নির্যাতন-নিবর্তনের উপলক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে-হচ্ছে-হবে। কিন্তু শেষ বিচারে মূল শেকড়ের বিষয় থেকে যাবে একটাই, তা হলো "শোষণ, আরো শোষণ"।

এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিচারহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব, দুর্নীতি, দুঃশাসন, স্বৈরাচার ইত্যাদির কারণ-পরিণাম সূত্রে শোষণই যে এসবেরই মূখ্য ও নিয়ামক কারণ এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকার কথা নয়। তাহলে শেষ বিচারে "বিচারহীনতার সংস্কৃতি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব" সংশ্লিষ্ট কার্যকারণের রাজনৈতিক অর্থনীতির চক্রাবর্তনের সূত্রটি হবে নিম্নরূপ:

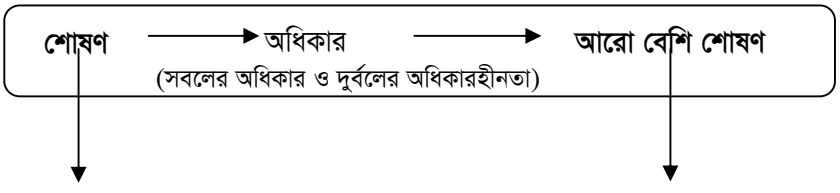

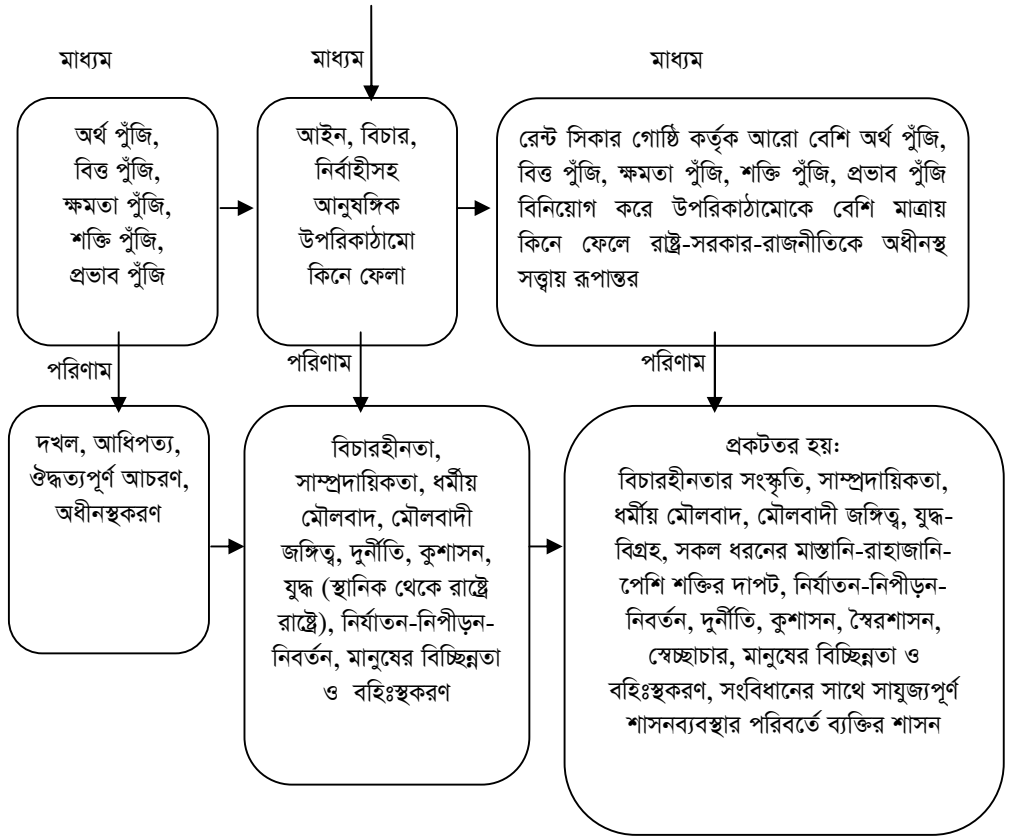

৪। "বিচারহীনতার সংস্কৃতি": উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি, কার্যকারণ, করণীয়

প্রচলিত অর্থে "বিচারক" (Judge) একটি বিশেষ সম্মানিত পেশা যে পেশার মূল কর্তব্য আইন-কানুন মেনে স্ব-বিচারবোধ প্রয়োগ করে বিচারিক কাজ সম্পন্ন করা। তবে ব্যাপক অর্থে সমাজে প্রচলিত বিচারকদের বাইরেও অনেক বিচারক আছেন যারা তাদের স্ব-স্ব পেশায় তাদের এক্তিয়ারভুক্ত (jurisdiction অর্থে) বিষয়ে বিচার করেন এবং রায়ও দেন (এ প্রসঙ্গে একটু পরে আসছি)। যদিও এ প্রসঙ্গে আমি প্রধানত প্রচলিত অর্থের "বিচার, বিচারক, বিচারহীনতা" সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছি তথাপি অপ্রচলিত অর্থের বিচারক সম্পর্কে না বললে "বিচারহীনতার সংস্কৃতির" সামগ্রিক ব্যাপ্তি বোঝা যাবে না। প্রথমেই আসা যাক প্রচলিত অর্থের "বিচার-বিচারক" প্রসঙ্গে। "বিচারক" হলেন একজন "পাবলিক অফিসার" বা "জনগণের কর্মকর্তা" যাকে বিচারিক আদালতে আইন-কানুন মেনে ন্যায়বিচার-সুবিচার-ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনোনিত অথবা নির্বাচিত করা হয় এবং যিনি বিচারস্থলের (কোর্টের) বিচারাধীন বিষয়ের কার্যবিবরণী (proceedings অর্থে) নিয়ন্ত্রণ করেন, আইন-কানুন সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদি নির্ধারণ করেন এবং স্বীয় বিচার-বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন। সর্বনাম হিসেবে বিচারক একজন ব্যক্তি-একজন কোর্ট কর্মকর্তা (Court Officer) যার বিচারাধীন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার আছে। সাধারণত 'কোর্ট' এবং 'বেঞ্চ' বলতে বিচারককেই বোঝায়। গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি এখানে বলে রাখা প্রয়োজন তা হলো বিচারক যেই হোন না কেন তাঁর এখতিয়ার অসীম নয়— তিনি তাঁর এক্তিয়ারাধীন যে কোনো বিচার কাজে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের (দেশের) সর্বোচ্চ আইন অর্থাৎ শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের বাইরে যেতে পারেন না, পারবেন না (আইনবিশারদেরা এ বিষয়ে আরো স্পষ্ট ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিতে পারবেন)। প্রচলিত অর্থে বিচারক দুই ধরনের: ট্রায়াল কোর্ট এবং আপিল কোর্ট। ট্রায়াল কোর্টের বিচারক বিচার কাজে সভাপতিত্ব করেন (সাধারণত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত), প্রাক-ট্রায়াল বিষয়াদি নির্ধারণ করেন, ট্রায়াল সিডিউল প্রণয়ন করেন, ট্রায়াল চলাকালীন সময়ে মৌখিক রুল প্রদান করেন, অংশগ্রহণকারীদের (বাদি-বিবাদি-সাক্ষি ইত্যাদি) স্বভাব আচরণ এবং বিচারের গতি নিয়ন্ত্রণ করেন, জুরি ট্রায়ালে জুরিদের উপদেশ দেন এবং সবশেষে বিচারের রায় প্রদান করেন। আর আপিলের বিচারক (যাদের সাধারণত "বিচারপতি বলা হয়") ট্রায়াল কোর্টের বিচারের রায় বা সিদ্ধান্ত শোনেন, ট্রায়াল কোর্টের রেকর্ডের বিবরণী পর্যালোচনা করেন, মামলাধীন পক্ষসমূহ প্রদত্ত সংক্ষেপ-বিবরণী পাঠ করেন, বোঝার চেষ্টা করেন,

আত্মস্থ করেন, এটর্নিদের মৌখিক যুক্তিতর্ক শোনেন এবং তারপরই সিদ্ধান্ত দেন যে ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত বা রায়ে ভুলত্রুটি হয়েছে কিনা, অন্যায়-অবিচার হয়েছে কিনা অথবা সিদ্ধান্ত ঠিকই আছে।

বিচারহীনতা যে "সংস্কৃতিতে" রূপান্তরিত হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পদ্ধতিতত্ত্বিয় বিষয়াদি (প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে) এবং কার্যকারণ সম্পর্কসহ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সূত্রবদ্ধকরণ (প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদ) ইতোমধ্যে বিশ্লেষণ করেছি। সংবিধান বিরোধী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দেশ ও বৃহত্তর সমাজকে বিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার-সুবিচারের নামে কি ধরনের অন্তহীন গভীরতম গর্তে ফেলে দিতে পারে এদেশে তার অনেক উদাহরণ আছে যা দিয়ে "বিচারহীনতার সংস্কৃতির" স্বরূপ, বিবর্তন ও মর্মবস্তুর কিছু ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এখানে আলোচনার সুবিধার্থে মাত্র একটি উদাহরণ দেয়া সমীচিন মনে করি। কারণ এই এক উদাহরণই যথেষ্ট মাত্রায় নির্দেশ করে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান বা শাসনতন্ত্র অমান্য করলে সমগ্র সমাজ দেহে কি ধরণের গভীর, অপূরণীয় এবং অনবায়নযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। উদাহারণটি আমাদের দেশের হাইকোর্ট ডিভিশনে ২০০০ সালের একটি রিট পিটিশন (Writ Petition No. 6016 of 2000; পিটিশনার বাংলাদেশ ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেড বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য)। রিট পিটিশনার বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে মুন সিনেমা হলের মালিকানা তার হাতে হস্তান্তরের আবেদন করলেন। এই রিট শুনানিতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করলেন দুই জন: বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক এবং বিচারপতি এটিএম ফজলে কবির। সকল কাগজপত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ এবং দেশ-রাষ্ট্র সমাজের সামুহিক স্বার্থ বিবেচনায় বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ২৯ আগষ্ট ২০০৫ সালে এক অনন্য ঐতিহাসিক রায় দিলেন যা বাংলাদেশের বিচারিক ইতিহাসে "সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইন কেইস" হিসেবে পরিচিত। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক প্রদত্ত বিচারের রায়ের খুঁটিনাটি বিষয়াদি এখানে আমার প্রসঙ্গ নয়। প্রসঙ্গটি এখানেই যে এই একটি বিচারিক রায়ই এ বিষয় প্রমাণে যথেষ্ট যে সংবিধান লঙ্ঘন করা যায় কিনা, লঙ্ঘন করলে দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের কি ক্ষতি হয় এবং সে ক্ষতি কিভাবে 'বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে' উজ্জীবিত করে এবং একই সাথে সে ক্ষতি কিভাবে সমাজের মতাদর্শিক বিচ্যুতি সাধনের মাধ্যমে সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে উচ্ছেদ করে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। আসা যাক সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনি আইন, ১৯৭৯-র বিরুদ্ধে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের রায় প্রসঙ্গে। আলোচনার সুবিধার্থে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী আইনের মূল বিষয়টি বলা দরকার। সহজ কথায় বিষয়টি এরকম: ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট (অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু হত্যার দিন) থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত যত ধরনের ঘোষণা জারি (proclamation অর্থে), মার্শাল ল রেগুলেশন এবং মার্শাল ল অর্ডার দেয়া হয়েছিল সাংবিধানিকভাবে অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এসব কিছুকেই জায়েজ করার লক্ষ্যে সংসদে আইন পাশ করে নেন যার নামই পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯। বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ২৯ আগস্ট ২০০৫-এ তাঁর রায়ে বললেন পঞ্চম সংশোধনী যেহেতু অসংবিধানিক, যেহেতু তা সংবিধানকে অধীন সত্তায় ও দাস সত্তায় রূপান্তরিত করেছে, যেহেতু ঐ সময়কালে যারা শাসন করেছে— তারা জনগণের প্রতিনিধি নয়— অন্যায়ভাবে-বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী ও স্বৈরশাসক, যেহেতু ঐ সময়ে সংসদ কার্যকর ছিল না এবং স্বৈরশাসক কর্তৃক দেশ শাসিত হয়েছিল, যেহেতু ঐ সময়কালে দেশ তার গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছিল, যেহেতু তা মুক্তি সংগ্রামের চেতনার সাথে সংঘাতপূর্ণ, যেহেতু তা জনগণের সাথে জালিয়াতি, যেহেতু যারা এ সংশোধনী করেছেন তাদের নিজেদেরই এ কাজ করার কোনো বৈধতা নেই, সেহেতু ঐতিহাসিক অপরিণামদর্শী পঞ্চম সংশোধনী আইন বেআইনি এবং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির মর্মার্থ বোধে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পঞ্চম সংশোধনী আইন বাতিলের পক্ষে ঘটনাক্রম ও সংশ্লিষ্ট যুক্তিসমূহ বলা দরকার। আমার বোধে বিচারপতি এবিএম খায়রুল হকের বর্ণনা ও যুক্তিক্রম এর সারকথা নিম্নরূপ [বিস্তারিত দেখুন সমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী সম্পাদিত The Bangladesh Law Times, The Constitution (Fifth Amendment) Act's Case Citation: 14 BLT (Special Issues), 2006, পৃ: ২৪০-২৪২]:

(ক) একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালিত হবে আইনের সরকার দ্বারা মানুষের নয় (by Government of Laws and not by man)।

(খ) সংবিধান বা শাসনতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌম জনগণের ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল-দলিল। এই সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন; অন্য যে কোন আইন-বিধি-বিধান-কর্মকাণ্ডকে এই সংবিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে; এর ব্যত্যয় হবে সংবিধানের লঙ্ঘন এবং তা হবে বাতিল ও অপরিণামদর্শী।

(গ) সংবিধান কর্তৃক সৃষ্ট তিনটি স্তম্ভ হলো আইন সভা (Legislature), নির্বাহী বিভাগ (The Executive), এবং বিচার বিভাগ (The Judiciary)। আইন সভার কাজ আইন প্রণয়ন করা; নির্বাহী বিভাগের কাজ আইন মেনে সরকার পরিচালন; বিচার বিভাগের কাজ সংবিধান মোতাবেক নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান নিশ্চিত ও কার্যকর করা। প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারী ও সেবাপ্রদানকারী (যেমন গণপ্রশাসন, প্রতিরক্ষাসহ অন্য সবাই) সংবিধানের বিধিসমূহের আওতাভুক্ত এবং তারা সংবিধানে বিধৃত ডিক্রি/অধ্যাদেশ মেনে চলতে বাধ্য।

(ঘ) বাংলাদেশের সংবিধানে মার্শাল ল অথবা মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ বলে কোনো আইন নেই। তাই যদি কেউ তা করে তাহলে সেটা হবে প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। এবং এ ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করা অধস্তনের জন্য রক্ষা কবজ হবে না। এমতাবস্থায়, ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট সকাল থেকে খন্দকার মুশতাক কর্তৃক অন্যায়ভাবে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল এবং বাংলাদেশকে মার্শাল ল শাসনের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রসিডেন্ট হওয়া— এসবই সংবিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন, এবং সে কারণে অবৈধ, আইনানুগ অধিকার বর্জিত এবং এখতিয়ারভুক্ত নয়। ১৯৭৫ এর ৬ নভেম্বর বিচারপতি আবুসাদত মোহাম্মদ সায়েমের প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং প্রধান মার্শাল ল প্রশাসকের ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেয়া এবং তার কর্তৃক ১৯৭৫ এর ৮ নভেম্বর-এর ঘোষণা দিয়ে ডেপুটি প্রধান মার্শাল ল প্রশাসক নিযুক্তি— এসবই সংবিধান লঙ্ঘন। ১৯৭৬-এর ২৯ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট আবুসাদত মোহাম্মদ সায়েম কর্তৃক তৃতীয় ঘোষণার মাধ্যমে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান-এর হাতে মার্শাল ল প্রশাসনের অফিস হস্তান্তর যার মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ঐ অফিসের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন— এসব কিছুই সংবিধানের চৌহদ্দি বহির্ভূত। প্রেসিডেন্ট আবুসাদত মোহাম্মদ সায়েম কর্তৃক মেজর জিয়াউর রহমানকে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনিত করা এবং জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রেসিডেন্ট অফিসের দায়িত্বগ্রহণ এসবই হয়েছে কোন ধরনের আইনানুগ অধিকার ব্যতিরেকে এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। সুতরাং ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৭৯-র ৯ এপ্রিল পর্যন্ত যত ঘোষণা (all proclamations), যত মার্শাল ল রেগুলেশন এবং যত মার্শাল ল অর্ডার জারি করা হয়েছিল সব বেআইনি, বাতিল এবং ঐতিহাসিক-অপরিণামদর্শী (all were illegal, void and *non est*)।

'বিচার' বললেই আমাদের মত সাধারণ মানুষের মানস কাঠামোতে সাধারণত চোর, ডাকাত, কোর্ট-কাচারি, থানা-পুলিশ, উকিল-মোক্তার, জর্জ-বিচারকদের ছবি ভেসে ওঠে। যে ছবি অপ্রিয়, সুখকর নয়। 'চোর' বললে আমরা বুঝি এমন কেউ যে না বলে এটা-ওটা নিয়ে যায়— হয় নিজে ব্যবহারের জন্য না হয় অন্যের কাছে বিক্রির জন্য। হতে পারে সে সিঁদেল চোর, ছ্যাচকা চোর, দারিদ্র্যের কারণে চোর অথবা অভ্যাসগত চোর (যে অন্যের বাড়ী-ঘরে চুরি না করতে পারলে রাতের বেলায় নিজের ঘরের এটা-ওটা এদিক-সেদিক সরিয়ে রাখে— অভ্যাস তো!)। আর 'ডাকাত' বললে বুঝি চোরের চেয়ে বড় কেউ, যে জানান দিয়ে আসে, অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে এবং বেশির ভাগ সময়ই খুন-জখম-আঘাত করে। ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার-সুবিচার হলে চোরের শাস্তি ছোট বা কম হবার কথা, ডাকাতের শাস্তি তুলনামূলক বেশি হবার কথা; আর 'খুনির' শাস্তি সর্বোচ্চ– ফাঁসি থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবার কথা। 'বিচারহীনতার সংস্কৃতি' প্রবণ দেশে 'চোরের' শাস্তি হয়, ডাকাত ও খুনির তেমন কিছু হয় বলে মনে হয় না। প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে যে রাজনৈতিক-অর্থনীতির সূত্র উপস্থাপন করেছি তাতে এটাই হওয়ার কথা। আমি আইনজ্ঞ বা আইনবিশারদ নই দেখে এর চেয়ে বেশি বলা ঠিক হবে না। তবে যতটুকু জানি আইন শাস্ত্রে চুরি-ডাকাতির একক কোনো সংজ্ঞা নেই; প্রকারভেদে দেশে দেশে পার্থক্য আছে; আবার দেশে দেশে শুধু সংজ্ঞাগত পার্থক্যই নয় শাস্তির বিধানেও ব্যাপক পার্থক্য আছে। আমার প্রশ্ন এসব ছোট চোর আর ছোট ডাকাত নিয়ে নয়, প্রশ্ন সংজ্ঞা বা শাস্তি নিয়েও নয়। বিচারহীনতার সংস্কৃতির আওতায় আমার প্রশ্নগুচ্ছ অন্যত্র: বিচারহীনতার ব্যাপ্তি ও স্বরূপ নিয়ে। চোর-ডাকাত তো বুঝি; বুঝি তাদের নিয়ে তুলনামূলক অতিকথন, অতিপ্রচার। কিন্তু যে বা যারা দেশ লুট করে, যারা ব্যাংক লুট করে লোপাট করে, যারা জনগণের (বা সরকারি) এবং দুর্বল ব্যক্তির বা গোষ্ঠির জমি-জলা-বন-জঙ্গলসহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুট করে তাদেরকে আইনের ভাষায় কি নামে অভিহিত করা হবে? চোর? ডাকাত? ডাকাতের সর্দার? খুনি? আর যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাদের শাস্তির বিধানটাই বা কি বা কেমন হবে? কে ঐ বিচার করবেন? কে নির্ভেজাল সত্য-ন্যায্য রায় দেবেন— কোন বিচারক? আবার কদিৎ-কদাচিৎ কখনও কোনো সত্যান্বেষি এবং/অথবা ন্যায়-নিষ্ঠ এবং/অথবা সৎ এবং/অথবা সাহসী মহৎপ্রাণ বিচারক যদি কোন কারণে সঠিক-সত্য রায়টি দিয়েই ফেলেন (ঐ বিচারক সন্দেহাতীতভাবে আমাদের সমাজে এবং এমনকি পরিবারে অবাস্তববাদী-অযোগ্য "গোয়াড়" ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হবেন) আর সেটা যদি দরিদ্র ও দুর্বলের পক্ষে হয় সেক্ষেত্রে কে-কখন-কবে ঐ রায় কার্যকর করবেন। দরিদ্র ও দুর্বলের বিচার কাজে বিচারকদের "বিব্রত বোধের" কথা আজ পর্যন্ত শুনিনি। কেউ তা

শুনেছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। তবে ধনীক শ্রেণির বিত্ত-সম্পদ বাড়ানোর মাধ্যম হিসেবে যারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন (রাজনীতি থেকে সুশীল সমাজ-শ্রেণি পর্যন্ত) তাদের ক্ষেত্রে বিচারকের "বিব্রত বোধের" কথা শুনি। এসব কেন হয়? বিচারক কি এমন কোন সরকারি চাকুরি করেন যে তার কর্মফল যে কোনো মূল্যে লুটেরাদের এবং অথবা সরকারের স্বার্থের অনুকূলে হতে হবে? আমার এসব কথাবর্তায় 'আদালত অবমাননা", "বিচারক অবমাননা", "সরকার অবমাননা" হলো কিনা জানি না, আর এসব জানা আমার খুব একটা প্রয়োজনও নেই। মূল কথা– আমাদের rent seeker অধ্যুষিত সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে রাষ্ট্র-সরকার-রাজনীতি-সুশীল সমাজ শ্রেণি-বুদ্ধিজীবী শ্রেণি-গণমাধ্যম— সবকিছুই rent seeker দেরই অধীনস্থ দাস-সত্তা (শুনতে বিব্রতকর মনে হতে পারে!) সেখানে আমার এসব প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ-নির্মোহ সত্য সদুত্তর দেবার সৎ সাহস আছে কার?

"বিচারহীনতার সংস্কৃতি" শুধুমাত্র কোর্ট-কাচারি-আদালত-জেল-হাজত-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। সংস্কৃতিটাই যখন বিচারহীনতার তখন বিচারহীনতা সর্বব্যাপ্ত হতে বাধ্য। শিক্ষক যখন তাঁর ছাত্রদের উদারহস্তে জ্ঞান বিতরণের পরিবর্তে দোকান খুলে বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন; চিকিৎসক যখন রোগীর সাথে তেমন কোনো কর্থাবার্তা না বলেই এবং/অথবা দুনিয়ার তাবৎ ডায়াগনোস্টিক টেস্ট করাতে বাধ্য করেন (তাও নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যেখানে হয় তিনি মালিক অথবা ভাগ পান); ইঞ্জিনিয়ার যখন বালি-সিমেন্ট রডে ভেজালসহ ড্রয়িং-ডিজাইনে মারপ্যাচ কষে অসৎ (অন) উপার্জন করেন; আইনজ্ঞ (এ্যডভোকেট, উকিল, ব্যারিস্টার ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা) যখন "সত্যকে মিথ্যা' আর "মিথ্যাকে সত্য" বানাতে তার মক্কেলের পক্ষে হেন অনৈতিক কাজ নেই যা করেন না— বিনিময়ে মক্কেলের কাছ থেকে যত পান তত এবং যতকাল পারেন ততকাল অর্থ-সম্পদ খসাতে থাকেন এবং একই সাথে কোর্ট-বিচার প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতাসহ মানুষকে চিরস্থায়ী বিপদগ্রস্থতার এক দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ করে ফেলেন; ব্যাংকার যখন আমানতকারীদের কষ্টার্জিত টাকা-পয়সা নিয়ে "যেমন খুশি তেমন সাজো" খেলায় মত্ত হয়ে দেশের ব্যাংক খাতের মোট ঋণ-অগ্রিমের ৯০ শতাংশই মোট ঋণ-অগ্রিম গ্রহিতাদের মাত্র ৪ শতাংশের হাতে নির্বিঘ্নে তুলে দেয় (এ এক মগের মুল্লুক।); যখন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি ব্যাংক থেকে ৪ হাজার কোটি টাকা লোপাট হবার পরে অর্থমন্ত্রী বলেন ৪ হাজার কোটি টাকা কোনো টাকা নয় আর অন্য আর একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক পুরোপুরি লুট হলেও মূল আসামী ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে; ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকগুলো তো কালো টাকার আখড়া; ঘুষসহ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক-অবৈধ পথ-পদ্ধতি ছাড়া ব্যাংকাররা কোনো কাজই তেমন করেন না; দেশের কেন্দ্রিয় ব্যাংক যখন বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর নির্দেশ-আদেশ ছাড়া এক কদমও এগুতে অক্ষম ও সস্তা জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে সদা জাগ্রত থাকে (এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ওদের মৌখিক নির্দেশে কারণ ওরা ওদের মনের ভাব অনেক ক্ষেত্রেই লিখে প্রকাশ করে না); অর্থমন্ত্রণালয়, কেন্দ্রিয় ব্যাংক, অর্থমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংসদিয় স্থায়ী কমিটিসহ স্তাবক-দালাল শ্রেণির কিছু অর্থনীতিবিদ যখন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষমতা-ভিত্তি দুর্বল করার মাধ্যমে রাষ্ট্রকেই দুর্বল করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরে নির্ঘুম রাত্রি যাপন করেন (এসব কিন্তু সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক); সরকারের রাজস্ব কর্মকর্তারা (বিশেষত আয়কর, কাস্টমস ও ভ্যাট বিভাগীয়) যখন দু'চার বছরেই কোটিপতি বনে যান এবং আর্থিকভাবে লোভনীয় স্থানে পদায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ ঘুষ দেন; সরকারি আমলারা যখন ফাইল ঠেকিয়ে, তথ্য গোপন করে, অপ্রয়োজনীয় সব প্রকল্প বানিয়ে (যার সাথে জনকল্যাণের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই), বিদেশী দাতা- ব্যবসায়ীদের প্রকল্প নির্বিচারে গিলে, বাছাইকৃত কিছু মানুষকে অন্যায়-অনৈতিক-অন্যায্য সুবিধে দেবার বিনিময়ে ঘুষসহ অনেক কিছুই খান; ব্যবসায়ীরা যখন খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল হ্রাস করেন এবং/অথবা রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রায়শই বাজারে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে জনসাধারণকে চিরকষ্টের মধ্যে ফেলে প্রয়োজনে নিঃস্ব করে দেন; গুটিকয়েক ফটকাবাজ যখন শেয়ার বাজার লুট করে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সর্বশান্ত করে এবং প্রকৃত ফটকাবাজদের নামধাম প্রকাশের পরেও অপরাধীরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে; বড় বড় ঠিকাদার-কন্ট্রাক্টররা যখন গোপনে মহা-আঁতাত করে বেআইনি-আইনি পথে (তথাকথিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ মান্য করে!) ভয়াবহ অবৈধ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশের বিপুল ও অপূরণীয় ক্ষতি করেন; ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা (সম্ভবত হাতে গোনা কয়েকজন বাদে) যখন মালিক এবং/অথবা সরকার পক্ষের দালাল হয়ে অভিজাত শ্রেণির নাগরিক বনে গিয়ে দেশে-বিদেশে সম্পদ গড়ে তুলে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেন; সংবাদপত্রসহ গণমাধ্যমের কর্মী সাংবাদিকদের অনেকেই (রাজধানী ঢাকা থেকে মফস্বল পর্যন্ত) যখন কেন যেন কোন পথে বেশ দ্রুতই গাড়ী-বাড়ী অর্থ-কড়ি ধন-সম্পদের মালিক বনে যান; পুলিশের কর্মকর্তারা (সম্ভবত বেশির ভাগই) যখন প্রায় সব কাজেই সবকিছুতেই ঘুষ খান এবং "ভাল পোস্টিং" এর (অর্থাৎ আর্থিকভাবে লোভনীয়) জন্য ঘুষ দেন; তদবিরবাজ "ভদ্রসমাজের অভিজাত ব্যক্তি" তদবির ব্যবসায়ীরা যখন অর্থ-সম্পদসহ অন্যান্য অনেক অনৈতিক কর্মকাণ্ডের

বিনিময়ে হেন অবৈধ কাজ নেই যা করেন না বা করতে পারেন না— তারা সবই পারেন সবই করেন; নিম্নবর্গের পেশা ব্যতিত অন্যান্য প্রায় সকল পেশার ক্ষেত্রেই অন্যায়-অবিচার-অবৈধ উপার্জন যখন সমতালে প্রযোজ্য; দুর্নীতি দমন কমিশনের ইনসপেক্টরসহ কমিশনের অনেকেই যখন নিজেরাই দুর্নীতিগ্রস্থ; প্রযুক্তি জ্ঞান সমৃদ্ধ এতসব গোয়েন্দা সংস্থা থাকলেও যখন মৌলবাদী জঙ্গিদের অস্ত্র ও অর্থের উৎস বলা যায় না, অথবা জানলেও জনগণকে জানানো হয় না, অথবা জানালেও এসবের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয় না; আর রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই— ক্ষমতায় যারা থাকেন, ক্ষমতায় যারা ছিলেন, আবার ক্ষমতায় যারা যেতে চান, এবং যারা নিজেরা ক্ষমতায় যেতে পারেন না তবে অন্যদের ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি হিসেবে কাজ করেন— যখন সারাদেশে মোট যত অবৈধ উপার্জন হয় তার ভাগের অংশ তারা পান এবং কেউ কেউ নিজেদের 'উঁচু-চেয়ার' অপব্যবহার করে স্বনামে-বেনামে ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি সম্পত্তি দখল-বেদখল, পোস্টিং-ট্রান্সফারের তদবিরসহ বহুবিধ মাধ্যমে সম্পূর্ণ অবৈধ পন্থায় ধনবান-বিত্তবান ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হন— এসবই তো অন্যায়, অবিচার, অনৈতিক, বিচারহীনতা এবং সম্ভবত ফৌজদারী অপরাধ। এসব যে হচ্ছে তাতে কি কারো সন্দেহ আছে? আসলে সন্দেহও নেই বিকারও নেই। বিকার থাকলে তো রুখে দাঁড়াতেন? তাহলে তো দেখছি আমাদের সমাজে উচ্চবর্গের মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনোভাবে অবিচার করেন। অবিচার করেন না শুধুমাত্র নিম্নবর্গের মানুষ— দরিদ্র ও দুর্বল মানুষ এবং তাদের সমাজ। উচ্চবর্গের বিভিন্ন পেশার মানুষরা এখন একই দলের সদস্য— "বিচারহীনতার সংস্কৃতির দল"; যেখানে দলীয় সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য সক্রিয়তার মাত্রায় এবং ভাগ পাবার মাত্রায়। অবশ্য এ সমস্যার সমাধান নেই কথাটি ঠিক নয়, কারণ "ওদের বিচার করবে যারা আজ জেগেছে সেই জনতা"— অবস্থাটা এখনও তেমন নয়। তবে "ওদের বিচার করবে যারা চিরনিদ্রায় সেই জনতা"— এ ধরনের ভাবনা হবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ এবং ঐতিহাসিক ভ্রান্তি।

'বিচারহীনতা' অর্থাৎ সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার না পাওয়া অথবা তা থেকে বঞ্চিত হওয়া এখন বিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। 'বিচারহীনতা' এখন এক 'জগদ্দল সংস্কৃতি'। 'বিচারহীনতা' শ্রেণিবিভক্ত সমাজদেহের গভীরে প্রোথিত এমন এক বিষের বীজ যা সমাজদেহের সর্বত্র পচন ধরায়, সমাজ দেহের অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনার শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়, মানুষের সৃজন ক্ষমতা আর মুক্ত চিন্তার স্বাধীনতার শক্তিকে নির্জীব করে দেয়, মুক্ত বুদ্ধি ও আলোকিত মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়। "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" যখন সমাজ দেহে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে এবং বিধিতে রূপান্তরিত হয় তখনই মানুষের জীবনে যা কিছু মূল্যবান-যা কিছু কল্যাণকর, সমাজের প্রগতির জন্য যা কিছু অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন সে সবই পর্যায়ক্রমে বিলীন হতে থাকে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে যা কিছু মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তি মানুষ, আলোকিত মানব সমাজ ও সভ্য সমাজের উদ্ভব-অস্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন সে সবই ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হতে থাকে; বিচারহীনতার এ সংস্কৃতি তুষ্ট-পুষ্ট করলে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সুবিচারবোধ, ন্যায় বিচারবোধ, ভাল-মন্দের নীতিবোধ-মূল্যবোধ-সৌন্দর্যবোধ— সবই ভোঁতা হয়ে যায়, এসবের কোনো কিছুই বাস্তবে আর কাজ করে না। বিচারহীনতার সংস্কৃতির আয়ুষ্কাল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল হলে মানুষের সহজাত এসব সুপ্রবৃত্তির ও আচার-আচরণের জায়গা দখল করে নেয় কু-প্রবৃত্তি ও অনাচার যা কোনো অর্থেই মানুষের জন্য কল্যাণকর হয় না। 'বিচারহীনতা' যখন স্বাভাবিক নিয়মে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ যখন তা সংস্কৃতির অংশে রূপান্তরিত হয় তখন যে ভিত্তির উপরে "বিচারহীনতা"র প্রক্রিয়া জন্ম নেয় এবং বিকশিত হয় সে ভিত্তি উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ-মূল্যহীন-নিরর্থ করে তোলে। যা আবার বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আগের তুলনায় আরো বেশি শক্তিশালী করে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির এ এক বিরামহীন চক্রাবর্তন-দুষ্টচক্র (যা তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র ছকে দেখিয়েছি)। উদাহরণ হিসেবে এরকম বলা চলে: শ্রেণি বিভক্ত সমাজে উপরের শ্রেণির (আমাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের রেন্ট সিকার দুর্বৃত্ত-লুণ্ঠনকারী-পরজীবী) অস্তিত্ব ও বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন যেসব শর্ত বহাল রাখা যা বহাল না থাকলে উপরের শ্রেণির অস্তিত্বই আর থাকে না অথবা তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে, এ শর্ত হলো শ্রেণি মই-এর নিচের তলায় যে ব্যাপক জনগোষ্ঠি আছে তাকে নীচের তলায় স্থায়ী বাসিন্দা করবার জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করা— যার মধ্যে প্রধান কাজটি হলো সমাজে বৈষম্য-অসমতা জিইয়ে রাখতে শোষণমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাটিকেই শক্তিশালী করা। আর তা করতেই প্রয়োজন আইন, বিচার, প্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমসমূহকে শ্রেণি মই-এর উপরের তলার গুটি কয়েক মানুষের (রেন্ট সিকার, দুর্বৃত্ত, লুণ্ঠনকারী, পরজীবী শ্রেণি) স্বার্থ রক্ষার বাহন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এসবকে জনগণের জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গে রূপান্তরিত করা। এসবের ফলেই শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সমাজের শ্রেণি মই-এর নীচের তলার বাসিন্দা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ— অর্থাৎ গরীব মানুষ, বহিঃস্থ মানুষ, নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্য-মধ্যবিত্ত মানুষসহ সব ধরনের 'দুর্বল' মানুষকে "মানুষের সমানাধিকার" অথবা "আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান" এসব স্লোগান সর্বস্ব আইনি কথাবার্তার বি-রাজনীতিকরণের মারপ্যাচে শাসন করা সম্ভব হয়। এ

প্রক্রিয়ার এক স্বাভাবিক পরিণতি হলো জনগণের স্বার্থবিরোধী অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসি-আধিপত্যবাদী দুর্বৃত্তায়িত গোষ্ঠির উত্থান ও বিকাশের ফলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে হতাশা-নিরাশাসহ আশাভঙ্গের ক্ষোভ হেতু প্রচলিত নেতৃত্বের প্রতি জনগণের মনের গভীরে ঘৃণা-বিদ্বেষ-অনাস্থা দানা বেঁধে ওঠা এবং ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাসহ মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিত্বের উত্থান ও সম্প্রসারণ (যেখানে সমকালীন বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় উপাদানই সম্মিলিত উদ্যোগে প্রগতিবিরূদ্ধ শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে)।

"বিচারহীনতার সংস্কৃতি" ও তার সৃষ্টির উৎসসহ কার্যকারণ সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবকসমূহ এখন যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে একদিকে যেমন আশু নিস্তারের কোনো পথ নেই আর অন্যদিকে সহজ পথে নিস্তারেরও কোনো মন্ত্র নেই। এ পথ কন্টকাকীর্ণ। কারণ শ্রেণি মই এর উঁচুতলার ঐসব লুণ্ঠনকারী-দুর্বৃত্ত-পরজীবী-উচ্ছিষ্টভোগি-আগ্রাসি-আধিপত্যবাদী-মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি-বিচারের রায় ক্রয়-বিক্রয়কারীরা দেশের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতাকে জিম্মি করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠিকে (যারা ওদের অভিধানে "দুর্বল শক্তি") আজ আক্ষরিক অর্থেই বলছে "আইন-বিচার-জীবনের নিরাপত্তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান— এসব কিছুর আমরাই নিয়ন্ত্রক"; "আমাদের লুণ্ঠন কর্মকাণ্ডে বাধা দিও না— বাধা দিলে তোমাদের পরিণতি ভাল হবে না"; "তোমাদের তথাকথিত মুক্তবুদ্ধি-মুক্তচিন্তা-স্বাধীনচিন্তা-অসাম্প্রদায়িক মন-মনন, তথাকথিত দেশপ্রেম, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা— ওসব বলা দরকার হলে বলো কিন্তু কখনও ভুলেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে ওসব অর্থপূর্ণ করার চেষ্টা করবে না। আর যদি তা কর তাহলে নিজ দায়িত্বেই করবে— কারণ এসব করলে তোমাদের জীবন রক্ষার দায়দায়িত্ব তোমাদেরই— আমাদের নয়", "তোমরা জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য এবং বিশ্ব ব্যাংক-আইএমএফ নির্দেশিত দারিদ্র্য দূরীকরণের কথাবার্তা নিয়ে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করতে থাকো— আমরা কিছুই বলবো না কারণ ওদের আদেশ-নির্দেশে আমরাও সেটা করি", "আর তোমাদের জন্য একটা শেষ কথা বলি— তোমাদেরকে আমাদের শর্তে চলতে হবে। আর এ শর্ত প্রত্যাখ্যান করলেও তোমরা চিরস্থায়ী শান্তিতে থাকতে পারবে— তবে সেটা হবে কবরের অথবা শ্মশানের শান্তি"।

"বিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার" বিষয়টি বহুমুখী-বহুরূপী-বহুমাত্রিক বিষয়। 'বিচার' বিষয়টি অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, মনস্তত্বসহ প্রকৃতির বিকাশের সাথে আন্তসম্পর্কিত একটি প্রত্যয়। সারবত্তা বিচারের সংজ্ঞায় না গিয়েও বলা যায় যে "বিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার" সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত সারবত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। এসব এমন কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয়ও নয় যে বৃহত্তর সমাজ কাঠামো ব্যবস্থা যে বৈশিষ্ট্যেরই হোক না কেন "বিচারক" যেই হোন না কেন, যে পর্যায়েরই হোন না কেন— তিনি সবসময়ই ন্যায় বিচার, ন্যায্যবিচার-সুবিচার নিশ্চিত করতে সক্ষম। এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। 'বিচারক' যেমন সমাজের বাইরের কোনো ব্যক্তি নন, তেমনি তিনি সমাজে প্রচলিত বিধি-বিধান অস্বীকার করে স্বীয় বিচার-বিবেচনাবোধ প্রয়োগে নিঃশর্ত সত্তা নন। দাসভিত্তিক আর সামন্তবাদভিত্তিক প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বিচারকেরা তো বলতেন "দাসের ঘরে জন্ম নেয়া শিশু জন্মসূত্রেই দাস আর সামন্ত জমিদার আমলে রায়ত-প্রজাদের ঘরে জন্ম নেয়া শিশু জন্মসূত্রেই সামন্তপ্রভুর জমিদারের প্রজা। এই দাস ও প্রজা— দাস ও প্রজা হিসেবেই জন্মগ্রহণ করে, মানুষ হিসেবে নয়; মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হিসেবে তো নয়ই"। কারণ তারা মানুষ হলে— মুক্ত-স্বাধীন মানুষ হলে— দাস মালিক ও সামন্তপ্রভুদের অত্যাচার-নির্যাতন-নিবর্তন-শোষণের লক্ষ্যবস্তু কে হবে; আর ঐ লক্ষ্যবস্তু না থাকলে দাস মালিক আর সামন্তপ্রভুদের অস্তিত্বের গ্যারান্টি কে দেবে? পুঁজিবাদে সারবস্তু একই হলেও ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। আর তা হলো আগের শ্রমদাতা দাস ও সামন্তপ্রভুর কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমদাতা প্রজা বাধ্য ছিলো যথাক্রমে দাস মালিক ও সামন্তপ্রভুর সেবা-দাসত্ব করতে, বেগার খাটতে। কিন্তু পুঁজিবাদ দাসকে দাসত্ব থেকে মুক্তি আর প্রজাকে সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে মুক্তি দিয়ে শ্রমদাতাকে স্বাধীন করে এমন পরাধীন করলো যে তার গায়ের চামড়া ছাড়া কিছুই রইলো না; মুক্তবাজারে স্বাধীনভাবে শ্রমশক্তি বিক্রি করা ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোনো পথই খোলা রইলো না। এ সুযোগে পুঁজিপতি মুক্ত-স্বাধীন শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে মজুরি দিলো আর বাড়তি-উদ্বৃত্ত শ্রমকে আত্মসাৎ করে পুঁজির সম্প্রসারণ করতে থাকলো; পূঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাতের ফলে পুঁজিপতির হাতে পুঁজি ঘনীভূত হতে হতে এক পর্যায়ে তা কেন্দ্রীভূত হয়ে পুঁজিবাদই একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হল। ক্রমাগত বাড়তে থাকলো বিত্ত-সম্পদ-সম্পত্তির মালিকানা থেকে ঐ সম্পদ সৃষ্টির মালিক মেহনতি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণির বিচ্ছিন্নতা; উত্তরোত্তর ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকলো ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রতি বৈষম্য-অসমতা। আর এসব ব্যবস্থা জিইয়ে রাখতে প্রয়োজন হল শোষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী মতাদর্শসহ সংশ্লিষ্ট মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠান। "আইন-বিচার-প্রশাসন-মৌলবাদ-রাজনীতি" এসবই ঐ শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী মতাদর্শ ও মতাদর্শ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান। শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার এহেন বিকাশ-অবস্থায় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া

"ন্যায়বিচার ও ন্যায্যবিচার" প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকারই কথা। এতকিছুর পরেও যেহেতু যে কোনো বিধিরই ব্যতিক্রম আছে সেহেতু কখনও কখনও হঠাৎ করেই কোনো না কোনো পদ্ধতিতে কোনো না কোনো বিচারক "বিচারহীনতার সংস্কৃতির" মধ্যেই ন্যায় বিচারবোধের পরিচয় দেন— একথা অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তবে এরও গভীর বিচার-বিশ্লেষণ প্রয়োজন যে কেন, কোন মুহূর্তে, কোন অবস্থায়, কোন পরিবেশে, কার-কোন স্বার্থে প্রতিকূল অবস্থাতেও বিচারক ন্যায় বিচার বোধের পরিচয় দিতে সক্ষম হন— এ ন্যায় বিচারবোধ আপাতদৃষ্টির নাকি প্রকৃত?

ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার প্রাপ্তি না'কি অধিকার (rights)। কিন্তু আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এ সম্পর্কে আধুনিক ইতিহাস শাস্ত্রের জনক এথেন্সিয় দার্শনিক থুকোডাইডেস 'অধিকার' সম্পর্কে যা বলেছেন তা এরকম: দু'জন অসম ব্যক্তি অথবা দু'টো অসম সত্তার মধ্যে অধিকার (সমান অধিকার অনেক দূরের কথা!) নিয়ে আলোচনা বাতুলতা— বাহুল্য মাত্র। সবল (শক্তিমান) ও দুর্বলের মধ্যে অধিকার নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতে পারে না। 'অধিকার' বিষয়টি শক্তিধরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আসলে Might is Right—"অধিকার শক্তিমানের মুঠোয় থাকবে"। শক্তিমান তাঁর অধিকার দুর্বলের উপর প্রয়োগ করবে এবং শক্তিমান যখন যেটা করবে সেটাই তার অধিকার। আর দুর্বলেরও অধিকার আছে(!)—তবে সে অধিকারটা স্ব-নির্ধারিত নয়, শক্তিমান তাকে যা আদেশ-নির্দেশ দেবে সেটা প্রতিপালনই দুর্বলের অধিকার। এর ব্যত্যয় ঘটলে শক্তিমান দুর্বলের উপর তাঁর অধিকার প্রয়োগ করবে যা হলো— শক্তির অধিকার, বন্দুকের অধিকার, ক্ষমতার অধিকার। আড়াই হাজার বছর আগের থুকোডাইডেস-এর অধিকার ভিত্তিক বৈষম্যপূর্ণ (ন্যায়) বিচারের এই নীতি আধুনিক কালেও সমভাবে প্রযোজ্য। তা না হলে আন্তর্জাতিক আদালত ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যখন সিদ্ধান্ত নিল যে কোনো দেশ যদি এককভাবে নিকারাগুয়ায়, ইরাকে, লিবিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ করে তাহলে তা হবে "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস", "শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ", "যুদ্ধাপরাধ", "মানবাধিকার লঙ্ঘন", "আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন"— তারপরেও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করে কোন অধিকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে নিকারাগুয়ায় নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদসহ লিবিয়ায় যুদ্ধ ও ইরাক দখলে যুদ্ধ করলো? এখানে বিচারহীনতার প্রসঙ্গ নেই, প্রসঙ্গ অধিকারের(!)। কারণ, থুকোডাইডেস নীতি অনুযায়ী বিশ্বপ্রভুত্ব-বিশ্বকর্তৃত্ব-বিশ্বনিয়ন্ত্রণ যে করবে 'অধিকার' তারই একচেটিয়া সম্পত্তি, বিচার সেই করবে, বিচারের ফল যদি সেই বিজয়ও হয় যে বিজয় আসলে "কবরস্থানের বিজয়" (victory of the graveyard) তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন বিশ্ব পরিচালনে একক একচেটিয়া-নিরঙ্কুশ ঐ অধিকারে অধিকারী বিধায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে বলতে পারে: "একক সিদ্ধান্তে কোন দেশ-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা আর জাতিসংঘের সনদ মানতে বাধ্য নই। ... আমরা নিরাপত্তা পরিষদে আসি যখন প্রয়োজন বোধ করি— আসতেই হবে দেখে আসি না। ... আমরা পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যে কোন প্রতিপক্ষীয় শাসনের বিরুদ্ধে যে কোন সময়ে যে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো যদি মনে করি যে ওদের গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরির সম্ভাবনা আছে(!)।" এই ঔদ্ধত্য স্বেচ্ছাচার ও অবিচার শুধু যে বিশ্বপ্রভুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়— এটা ছোট প্রভুদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য তবে বিষয়টা বড় প্রভুর স্বার্থানুকূল হলে বড় প্রভুর অনুমতি সাপেক্ষে বিচার হবে যেখানে ন্যায্য-অন্যায্যতার ন্যায়-অন্যায়ের প্রসঙ্গ নেই।

প্রাসঙ্গিক বিধায় বলা প্রয়োজন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিক চেনি-রোনাল্ড রামসফেল্ড-কলিন পাওয়েল ২০০২ সালে (সেপ্টেম্বর মাসে) বিশ্বপ্রভুত্ব আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এক মহা-কৌশল (Grand Strategy) প্রণয়ন করলেন, যেখানে বলা হল "আমরা ভালো" আর "ওরা শয়তান"। বিশ্বপ্রভুত্বের এই মহা-কৌলশটাই পরবর্তীতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দুনিয়াব্যাপি নির্বিচারে প্রয়োগ করলো কোন অধিকারে, কার এবং কোন ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মহাপ্রভুত্ব-বিশ্বপ্রভুত্ব সংক্রান্ত অধিকারের(!) এই গ্রান্ড স্ট্রাটেজি বা মহা-কৌশলের ফর্মুলাটা সোজা। আর তা হল "পঁচা আপেল তত্ত্ব" (Rotten Apple Theory)। তত্ত্বটির সারকথা এরকম: এক বস্তা 'ভালো' আপেলের মধ্যে একটা 'পঁচা' আপেল থাকলে ঐ 'পঁচা' আপেল আস্তে আস্তে বস্তার 'ভালো' আপেলগুলোতে পচন ধরাবে। ফলে সব 'ভালো' আপেল পচে যাবে। সুতরাং, সময় নষ্ট না করে 'পঁচা' আপেল ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। এখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে 'ভালো' আপেল হল সেই সব মতাদর্শিক নেতৃত্ব দেশ-রাষ্ট্র-ভূখণ্ড যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত, অনুরক্ত, অনুগত, বাধ্য— আর পঁচা আপেল হল সেই সব মতাদর্শিক নেতৃত্ব-দেশ-রাষ্ট্র-ভূখণ্ড যারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভক্ত নয়, অনুরক্ত নয়, অনুগত নয়, বাধ্য নয় অবাধ্য অর্থাৎ যারা প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে (স্বপ্নের বাস্তবায়ন তো একদমই মহা-মারাত্মক বিষয়!)। এবং সে কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রতিকূল এসব 'পঁচা' আপেল যে কোন অজুহাতে, যে কোনো মূল্যে, যে কোনো

পন্থায় যথাদ্রুত ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে হবে 'পঁচা আপেল'। এভাবেই "পঁচা আপেল" হিসেবে চিহ্নিত করে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্নকে, চিলির প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দেকে, পানামার প্রেসিডেন্ট ওমর টোরিজোসকে, ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট জেইমি রোল্ডসকে, কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বাকে, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদতকে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে, লিবিয়ার প্রসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিসহ বিশ্বের অনেকেই যারা ছিলেন স্বাধীনতাকামী-সার্বভৌমত্ব রক্ষাকারী দেশপ্রেমিক ব্যক্তিত্ব-রাষ্ট্রনায়ক অথবা বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবাধ্য। আর এতসব হত্যাকাণ্ড আর হত্যাভীতি থেকেই দেশে দেশে জন্ম নিয়েছে "ভালো আপেল"— রাজতন্ত্র, স্বৈরাচার, সেনাশাসন, গণতন্ত্রের মোড়কে স্বৈরশাসন, দালালতান্ত্রিক শাসন, চরম মৌলবাদী-জঙ্গিবাদী ধর্মতান্ত্রিক আল-কায়দা-বিন লাদেন-মোল্লা উমরিয় তালেবানি শাসন, ইসরায়েলে ইহুদিবাদী নিষ্ঠুর শাসনসহ বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাভিত্তিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "পঁচা আপেল তত্ত্বের" বাস্তব প্রয়োগের সাথে পৃথিবীর যেকোনো দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট অধিকারহীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার অসম্ভাব্যতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতির উদ্ভব এবং সাম্প্রদায়িক অথবা ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান-বিকাশ-বিস্তৃতির যোগসূত্র এখানে স্পষ্ট।

সমাজের একক মানব সত্তা হিসেবে এবং মানব সমষ্টি হিসেবে শত-শত বছর ধরেই এ-ভূখণ্ডে আমরা সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার প্রাপ্তির সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে এসেছি। আমরা সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার প্রার্থনা করেছি কিন্তু কখনও পাইনি। "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" এখানে বিচারিক সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের প্রায় দুইশত বছরে আমরা শোষিত ও শাসিত হয়েছি—বিচার পাইনি; পাকিস্তানের নয়া-উপনিবেশিক শাসনামলে আমরা দুই অর্থনীতির বৈষম্যের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়েছি— বিচার পাইনি, পেয়েছি বঙ্গবন্ধুর ভাষায় 'অত্যাচারের ইতিহাস'— আর তাই এ দেশের জনগণের পক্ষে ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট ভাষায় বললেন "আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ, দশ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানিসহ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হ'ল কিন্তু দীর্ঘকালের "বিচারহীনতার সংস্কৃতি"-র আবহে স্বাধীন দেশে আবারও "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" জেঁকে বসানোর প্রক্রিয়া পাকাপোক্ত করা হ'ল। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে মহান মুক্তিসংগ্রামের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে বৈষম্যহীন ও অসাম্প্রদায়িক মানুষের আলোকিত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ও সংশ্লিষ্ট মৌল নীতির ভিত্তিতে আমরা যে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-বিচারিক-প্রশাসনিক প্রগতিবাদী কাঠামো বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলাম সেখানে অনেক মৌলিক বিষয়াদির মধ্যেই সবার জন্য, বিশেষতঃ ব্যাপক গরীব, দু:খী, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত মানুষের কাছে মুক্তি ও স্বাধীনতার অন্যতম মর্মকথা "সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার" পৌঁছে দেবার কথা ছিলো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পূর্তির ঠিক আগের দিনে (২৫ শে মার্চ ১৯৭৫, বঙ্গবন্ধুর জীবনের শেষ "জনসভা ভাষণ") রেসকোর্স ময়দানে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা উপলক্ষে জনসভায় বঙ্গবন্ধু বললেন "... বিচার, বিচার! বাংলাদেশের বিচার! ইংরেজি আমলের বিচার আল্লাহর মর্জি যদি সিভিল কোর্টে কেস পড়ে সেই মামলা শেষ হইতে লাগে প্রায় ২০ বছর। ... এই বিচার বিভাগকে নতুন করে এমন করতে হবে যে থানায় ট্রাইব্যুনাল করার চেষ্টা করছি এবং সেখানে মানুষ এক বছর বা দেড় বছরের মধ্যে বিচার পাবে— তার বন্দোবস্ত করছি। ... দু:খী মানুষের উপর ট্যাক্স বসিয়ে আমি আপনাদের পুষতে পারব না।" শেষ বিচারে এসবের উৎসমূলে আছে মানুষে-মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি-পুনসৃষ্টিকারী এক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক রাষ্ট্রকাঠামো যা একই সাথে একদিকে গুটিকয়েক শোষক-দুর্বৃত্ত-পরজীবী-লুণ্ঠনকারী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে (যা সম্পূর্ণভাবে মুক্তিসংগ্রামের চেতনা বিরুদ্ধ) এবং বৈষম্য-অসমতা উত্তরোত্তর বাড়াতে থাকে আর অন্যদিকে জনগণের স্বার্থ বিরোধী এই প্রক্রিয়া সেই সব ফাঁক ফোকর সৃষ্টি করে যেখানে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ-জঙ্গিবাদসহ সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা পরিপুষ্ট হয়।

১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা দীর্ঘকালের, বলা যায় ইতিহাস সূত্রে প্রাপ্ত, "বিচারহীনতার সংস্কৃতি" থেকে "সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচারের" সংস্কৃতি এবং "ধর্মের রাজনীতিকরণ ও ধর্মীয় উন্মাদনার সংস্কৃতি" থেকে "ধর্ম নিরপেক্ষতার সংস্কৃতি"সহ বৈষম্যহীন-সমাজতান্ত্রিক এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বিশ্বপ্রভু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের এ দেশিয় গুটিকয়েক দালাল-দোসর রাজাকার-যুদ্ধাপরাধী বাদে দেশের আপামর জনসাধারণ ঐ স্বপ্নের সহযাত্রি হয়েছিলো। কিন্তু বিশ্বপ্রভুর আনুগত্যহীন-অবাধ্য হলে যেমন "পঁচা আপেলের" মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়— সে বর্বর আচরণটাই বিশ্বপ্রভুরা

করলো বঙ্গবন্ধুর প্রতি। আর এ কাজটি তারা করলো ঠিক সেই সময়ে যখন বঙ্গবন্ধু তার দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করে (১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে জনসভার ভাষণে) নতুন সমাজব্যবস্থার ভিত রচনায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা উপড়ে ফেলার কথা বললেন, সমাজতন্ত্রের কথা আরো জোর দিয়েই বলা শুরু করলেন, দুর্নীতিবাজদের উত্থান ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণআন্দোলনের ডাক দিলেন, শর্তাধীন বৈদেশিক সাহায্য না নেবার কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বলা শুরু করলেন গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলকভাবে বহুমুখী সমবায় গঠনের কথা বললেন, শিক্ষিত সমাজসহ আমলা-বুদ্ধিজীবীদের মন-মানসিকতার দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করে চরিত্র শুদ্ধির তাগাদা দিলেন, যুবসমাজকে ফুলপ্যান্ট ছেড়ে হাফপ্যান্ট পড়ে গ্রামে গ্রামে বহুমুখী সমবায়ে কাজ করার তাগিদ দিলেন, ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা আরো দৃঢ়তার সাথে বললেন, এবং আন্তর্জাতিক বাজারে গরীব দেশের বিরুদ্ধে ধনীদেশের ব্যবসায়ী মারপ্যাচের বিষয়াদি উল্লেখ করলেন— তখন থেকেই একদিকে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আর অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানসহ ঐ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দালাল-দোসরদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যৌথ পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড অতীতের তুলনায় আরো অনেক বেশি দ্রুততার সাথে ও কার্যকরভাবে জোরদার হতে থাকলো। প্রতিবিপ্লবীদের জয় হলো ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট পরিকল্পিতভাবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে। এরপর থেকে শুরু 'বঙ্গবন্ধুহীন' বাংলাদেশের উল্টো পথে যাত্রা। এখান থেকেই শুরু আমাদের মুক্তি ও স্বাধীনতার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরবর্তী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে উল্লিখিত প্রতিক্রিয়াশীল যৌথ শক্তির উদ্যোগে লাগাতার সেনাশাসন, স্বৈরতন্ত্র, সেনাশাসনের মোড়কে গণতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী শক্তি তোষণ-পোষণ, ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনীতি ও অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত— এসবই আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে সম্পূর্ণ সচেতনভাবেই তার বিপরীতে অর্থনীতি ও রাজনীতিকে দুর্বৃত্তায়িত করলো। এ ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি শুধু পুনর্বাসিতই হয়নি তারা ২০-২৫ বছরে এমন এক ব্যবস্থা-কাঠামো সৃষ্টি করেছে যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশ পরিচালনের দায়িত্বে যে বা যারাই থাকুন না কেনো প্রকৃত চালকের আসনে শক্তভাবে জেঁকে বসেছে তারা যারা নিজেরা কোনো সম্পদ সৃষ্টি করে না— যারা অন্যের সম্পদ হরণ, দখল, বেদখল, জবরদখল, আত্মসাৎকরণের মাধ্যমে rent seeker (লুটেরা, পরজীবী, ফাও খাওয়া শ্রেণি, দুর্বৃত্ত) গোষ্ঠী মাত্র। এই rent seeker গোষ্ঠী বিগত ৪০ বছরে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করেছে যেখানে সরকার ও রাজনীতি তাদেরই কথায় ওঠাবসা করে। এটাই ১৯৭৫ এ বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রকৃত সত্য ভাষ্য যা অস্বীকার করলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-দর্শন ধারণ করে ভবিষ্যতে এগুনো দুরূহ হবে।

"বিচারহীনতার সংস্কৃতি" প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এদেশে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়া ও বিচারের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রশ্ন উত্থাপন না করা হয়। অবশ্য বলে রাখা দরকার যে "সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার ও বিচারহীনতার সংস্কৃতির" রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়াদি ইতোমধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত (এবং সম্ভবত বেশ গভীরতার সাথেই) বিশ্লেষিত হয়েছে। এদেশে অনানুষ্ঠানিক বিচারের অন্যতম রূপকে বলা হয় "সালিশ"। এককালে হয়তো বা সালিশে কিছু ফলপ্রদ-কার্যকর বিচারিক ফল পাওয়া যেতো। এখন সে অবস্থা নেই। ক্ষমতার নিয়ন্ত্রক রেন্টসিকার লুণ্ঠনকারী, অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নকর্তা-আধিপত্য বিস্তারকারী, পরজীবী শ্রেণীর গুটিকয়েক ব্যক্তি তাদের স্ব-স্বার্থ বজায় রেখে প্রথমেই ঠিক করে দেন "তাল গাছ কার", আর তার পরে বিচার করে দেন। যে বিচার কোন অর্থেই "সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার হবার কোন কারণ নেই। এ হলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মহা-কৌশলের (গ্রান্ড স্ট্রাটেজি) স্থানীক রূপমাত্র। আর আনুষ্ঠানিক বিচারের প্রধান দু'টি রূপ হলো— দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা। দেশে সব মিলে আনুষ্ঠানিকভাবে চলমান রায়-অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা হবে আনুমানিক ২৫ লক্ষ। আর এসব মামলার প্রায় ৮০ শতাংশই জমি-জাতি সংশ্লিষ্ট। জমি সংক্রান্ত দেওয়ানি মোকাদ্দমা সুরাহা হতে ৩ বছর থেকে ৪৫ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায় (গড়ে সময় লাগে সাড়ে নয় বছর), মামলায় কোন না কোন ভাবে সংশ্লেষ আছে ১৫ কোটি মানুষের দেশের ১২ কোটি মানুষ (এক মামলায় গড়ে বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪০ জন জড়িত, এবং একই ব্যক্তি একাধিক মামলায় জড়িত); মামলাধীন উভয় পক্ষকে ঘিরে ঘুষ-দুর্নীতি সর্বব্যাপ্ত; মামলার রায় কেনা-বেচা হয় (অবশ্যই কার্যত ধনীর পক্ষে, রেন্ট-সিকার লুণ্ঠনকারী-দুর্বৃত্তদের পক্ষে, গরীবের পক্ষে নয়)। এসবের ফলে সমাজদেহে সবচে মারাত্মক ও অপরিমেয় যে ক্ষতি সাধন হয় তা হলো এরকম যে যে হারে মামলা নিষ্পত্তি হয় তা যদি বজায় থাকে এবং আগামীকাল থেকে যদি দেশে আর নতুন কোনো মামলা নাও হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে মামলাজনিত মোট ভোগান্তি-বর্ষের (suffering years) পরিমাণ হবে ২.৫ কোটি বছর— সামাজিক পুঁজি গঠনে এ এক মহাপ্রতিবন্ধকতা। (বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত ও পি কে রায়, বাংলাদেশে ভূমি মামলার রাজনৈতিক অর্থনীতি)।

বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিশেষ ক্ষেত্র ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গ। এ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণকারী গণজাগরণ মঞ্চসহ দেশের সকল রাজনৈতিক দল-সংগঠন-ব্যক্তি বেশ চিন্তাভাবনা করেন। বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এ নিয়ে যেসব ভ্রান্ত ধারণা অথবা অজ্ঞতা কাজ করছে (কারণ আমরা সাধারণ মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হইনি) প্রথমেই তা দূর করা প্রয়োজন। বিষয়গুলি এরকম: (ক) ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার-এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যারা হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর দালাল-দোসর হিসেবে অথবা কোনো রাজনৈতিক দল অথবা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে বিভিন্নভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছিল তাদের বিচারের লক্ষ্যে "দালাল আইন" [Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order 1972, P.O. No. 8 of 1972] প্রণিত হয়। দালাল আইনের আওতায় প্রায় ৪০ হাজার দালালকে জেলে নেয়া হয়, এদের মধ্যে আনুমানিক ৩০ হাজারের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়, আর ১০ হাজার দালাল যারা ৪ ধরনের অপরাধ করেছিল (হত্যা. ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ) তাদের সাধারণ ক্ষমা করা হয়নি। ১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর তারিখে অবৈধ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবুসাদত মোহাম্মদ সায়েম এবং অবৈধ ডেপুটি মার্শাল ল প্রশাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এক ঘোষণায় সংবিধানের প্রথম সিডিউল থেকে "দালাল আইন" বাতিল ঘোষণা করলেন [দেখুন, Second Proclamation (Third Amendment) Order, 1975 (Second Proclamation Order No. III of 1975, dated December 31,1975)। (খ) বঙ্গবন্ধু সরকার ১৯৭৩ সালে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সার সংগ্রহের আকারে গ্রথিত (Codified law) আন্তর্জাতিক অপরাধ বিষয়ক আইন প্রণয়ন করলেন যেটাই "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন ১৯৭৩" (International Crimes Tribunals Act 1973, Act XIX, 1973)। ১৯৭৩ সালের এই আইনের ভিত্তিতেই ২০০৫ সালের ২৫ শে মার্চ গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ যা ১৯৭১-এ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিচারকার্য পরিচালনা করছে। এখানে দুটো ভাল কথা বলে রাখা উচিত যে ১৯৭৩-এর এই আইনে কোনো সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি, আর দ্বিতীয়ত সৌভাগ্যের কথা যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭২-এর "দালাল আইন" বাতিল করলেও ১৯৭৩-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন বাতিল করতে ভুলে গিয়েছিলেন। (গ) ১৯৭২-এর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন যার ভিত্তিতেই আজ ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ পরিচালিত হচ্ছে ঐ আইনে পাঁচ ধরনের অপরাধের বিচারের বিধান আছে: (১) মানবাধিকার লঙ্ঘন (Crime against humanity), (২) শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ (Crime against peace), (৩) গণহত্যা (Genocide), (৪) যুদ্ধাপরাধ (War crime), এবং (৫) ১৯৪৯ সনের জেনেভা কনভেনশনে বিধৃত সশস্ত্র সংঘর্ষকালীন সময়ে যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন। (ঘ) যে সকল অপরাধের বিচার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর প্রক্রিয়াধীন তার মধ্যে আছে গণহত্যা, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন, সম্পদ লুণ্ঠন, আটক, কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে উচ্ছেদ বা নির্মূল, দাসত্ব, কারারুদ্ধকরণ, অপহরণ, নির্বাসন, জাতি-ধর্ম-নৃগোষ্ঠির প্রতি নিপীড়ন-নির্যাতন-নিবর্তনসহ যে কোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোনো দল বা গোষ্ঠির সদস্য হত্যা, কোনো দল বা গোষ্ঠির কোনো সদস্যের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন-নিবর্তন, শিশুদের যুদ্ধে ব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘন-শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধ-গণহত্যা-যুদ্ধাপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ, এসব সম্পর্কে জ্ঞাত অথচ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত না করা ইত্যাদি। এবং আইনে এসব অপরাধের আওতায় বিচার হতে পারে ব্যক্তির, গোষ্ঠির, সংগঠনের, সামরিক সদস্যদের (যে কোনো দেশের নাগরিকের), এবং সহায়ক বাহিনীর (auxiliary forces) সদস্যদের (ঐ সদস্যের নাগরিকত্ব যে দেশেরই হোক না কেন)। সুতরাং স্পষ্ট যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একদিকে যেমন অতি-সুচিন্তিত একটি বিচারিক সংস্থা অন্যদিকে তার এখতিয়ার সঠিকভাবেই ব্যাপক-বিস্তৃত। আমার এসব কথা বলার কারণ এই নয় যে আমি ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্যদের অবগত করাতে চাই। এসব বলার মূল কারণ আমি এমন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করতে আগ্রহী যে প্রশ্ন সম্ভবত সবাই করবেন অথবা বিষয়টি সম্পূর্ণ অবগত হলে অবশ্যই করবেন।

আজ থেকে পাঁচ বছর আগে (২৫ মার্চ ২০১০) যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, বাংলাদেশ গঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে দেশে-বিদেশে ইতোমধ্যে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয়েছে-হচ্ছে-হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজে ট্রাইব্যুনাল যথাসাধ্য চেষ্টা করছে (যদিও প্রাক-অভিজ্ঞতার অভাব, জনবল স্বল্পতা এবং বিচারক ও সংশ্লিষ্টদের জীবনের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ বাস্তবতা)। "বিচারহীনতার সংস্কৃতির" নিহিতার্থ শুধু এইই নয় যে কোনো পক্ষ সুবিচার-ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার পাচ্ছেন না কারণ "বিচার পক্ষপাতদুষ্ট", "বিচার শ্রেণী

নিরপেক্ষ নয়", "বিচার বস্তুনিষ্ঠ বা নির্মোহ নয়" এবং "নিয়ামক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো বিচারের রায়কে প্রভাবিত করে" ইত্যাদি। সাধারণভাবে এসব সত্য হলেও যুদ্ধপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে তা ততটা প্রযোজ্য নয় বলেই মনে হয়। আমার মতে 'বিচারে বিলম্ব' বিচারহীনতার সংস্কৃতির অন্যতম মানদন্ড। একথাটি বিবেচনায় রেখে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট সবার চিন্তার জন্য তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন জরুরি বোধ করছি। প্রশ্নগুলি এরকম: (১) বাংলাদেশে মোট যুদ্ধাপরাধীদের প্রকৃত সংখ্যা কত? আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যে সংখ্যা বলছে সেটাই কি চুড়ান্ত সংখ্যা নাকি সংখ্যাটি আরো অনেকগুণ বেশি? (২) সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অর্থাৎ প্রথমে ট্রাইব্যুনালের শুনানি ও রায় এবং পরে আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড— কবে নাগাদ শেষ হবে? (৩) সকল যুদ্ধাপরাধীদের চূড়ান্ত রায় কবে নাগাদ কার্যকর হবে? আমার জানামতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এখন পর্যন্ত (৯ এপ্রিল ২০১৫ পর্যন্ত) মোট ৫৫৬ জন ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছে (ট্রাইব্যুনালে এদের বলা হয় তালিকাস্থ যুদ্ধাপরাধী)। এই ৫৫৬ জন যুদ্ধাপরাধীর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৭ জনের ট্রাইব্যুনালের রায় হয়েছে যার মাত্র ১টি রায় (আব্দুল কাদের মোল্লা) কার্যকর হয়েছে, ২জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন (গোলাম আজম ও মো: আব্দুল আলীম), মাত্র ৩টি রায় আপিল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়েছে (আব্দুল কাদের মোল্লা, দেলোয়ার হোসেন সাইদী, মো. কামারুজ্জামান)। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে ২টি ট্রাইব্যুনাল কাজ করছে। ট্রাইব্যুনালে এ মুহূর্তে ১৮টি মামলা চলমান। অর্থাৎ এখন পর্যন্ত চিহ্নিত (তালিকাস্থ) ৫৫৬ জন যুদ্ধাপরাধীর মধ্যে গত ৫ বছরে ট্রাইব্যুনাল ১৭টির রায় দিয়েছেন (যার মাত্র ৩টি আপিল বিভাগে নিষ্পত্তি হয়েছে) আর এখন (২০১৫ সালে) ১৮টি মামলা চলমান। এই যদি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের গত ৫ বছরের ব্যালান্স সিট-হালহকিকত হয় সে ক্ষেত্রে আমার সহজ পাটিগণিত বলে যে অবস্থা এরকম চলতে থাকলে অর্থাৎ যদি একটি ট্রাইব্যুনাল বছরে ৫টি মামলার শুনানির রায় প্রদান করতে সক্ষম হয় তাহলে দুই ট্রাইবুনাল মিলে বছরে ১০টির বেশি যুদ্ধাপরাধীদের মামলার শুনানিসহ রায় প্রদানে সক্ষম হবে না (অবশ্য "গ্যাং মামলা" হলে সংখ্যাটি আনুপাতিক হারে বাড়বে)। আর তাইই যদি হয় তাহলে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত (তালিকাস্থ) ৫৫৬ জনের মধ্যে যে ১৭ জনের রায় ট্রাইব্যুনাল দিয়েছেন এবং সেই সাাথে যে ১৮টি মামলার বিচার প্রক্রিয়া এ মুহূর্তে চলমান সেগুলো হিসেবের বাইরে রাখলেও যে ৫২১টি মামলা অবশিষ্ট থাকে সেগুলির শুনানি ও রায় প্রদানে দুই ট্রাইব্যুনালের মোট ৫২ বছর সময় লাগবে। এতো গেলো ট্রাইব্যুনালের শুনানি ও রায়, এরপরে আছে রিভিউ-আপিল বিভাগে নিষ্পত্তির সময় আর তারপরে রায় কার্যকর করা (ফাঁসির রায়ের আসামী বিদেশে থাকলে কি করবেন?)। কিন্তু ৫২ বছর যুদ্ধাপরাধীরাও বাঁচবেন না, ৫২ বছর মুক্তিযোদ্ধারাও বাঁচবেন না। তাহলে কি ধরে নেবো এখানেও বিলম্বজনিত বিচারহীনতার সংস্কৃতি ("Justice delayed justice denied") ক্রিয়মান? তা যদি না হয় সেক্ষেত্রে আগামী পাঁচ বছরে অন্তত ইতোমধ্যে চিহ্নিত-তালিকাস্থ যুদ্ধাপরাধীদের ট্রাইব্যুনালে শুনানি, রায় এবং আপিল বিভাগে নিষ্পত্তিসহ রায় কার্যকর করতে কমপক্ষে ১০টি ট্রাইব্যুনাল গঠনসহ আপিল বিভাগে আপিল শুনানি দ্রুততর করতে যোগ্য-জ্ঞানসমৃদ্ধ-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল-ন্যায়বোধ সম্পন্ন-সাহসী বিচারকদের সমন্বয়ে পৃথক আপিল বেঞ্চ গঠন যুক্তিসঙ্গত হবে। তাতেও কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সম্পন্ন হবে না। কারণ এতো গেলো ইতোমধ্যে চিহ্নিত-তালিকাস্থ যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গ। সেই যুদ্ধাপরাধী যাদের নাম এখনও তালিকাস্থ নয় কিন্তু তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে আছে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কি হবে? আমার হিসেবে এ সংখ্যা তো হবে কমপক্ষে ৫,০০০ জন (১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষকে কারা হত্যা করেছে? কারা ১০ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমহানী করেছে? সমগ্র দেশে মোট কতটি শান্তি কমিটি ছিল? রাজাকার-আলবদর-আল শামস বাহিনীর সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল? এসব তথ্য তো আমাদের অজানা হবার কথা নয়)। সম্ভাব্য যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যা কমপক্ষে ৫,০০০ জন— আমার এ হিসেব যদি সত্যের কাছাকাছি হয় সেক্ষেত্রে বর্তমান দুই ট্রাইব্যুনাল দিয়ে বিচার কাজ শেষ করতে সময় লাগবে কমপক্ষে মোট ৫০০ বছর; আর যদি ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা ১০-এ উন্নীত করা যায় সেক্ষেত্রে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ সম্পন্ন করতে সময় লাগবে মোট ১০০ বছর। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ট্রাইব্যুনালের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এখন বেশ কিছু মামলা আসছে যে গুলি একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয় যৌথ মামলা (যেখানে অপরাধীর সংখ্যা মামলাপ্রতি ২ থেকে ৮ জন পর্যন্ত এবং গড়ে ৩ জন)। এ কথাও জানা গেছে যে মোট মামলার ৫০ শতাংশ হবে একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর অন্য ৫০ শতাংশ হবে যৌথ মামলা। যদি সেটাও হয় সেক্ষেত্রে ১০টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করলেও সম্ভাব্য মোট মামলার বিচার নিষ্পত্তি হতে আমার হিসেবে সময় লাগবে কমপক্ষে ৩৩ বছর (আর ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা এখনকার মত দুটি থাকলে লাগবে ১৬৫ বছর)। আমার হিসেব অতিরঞ্জিত হলে ঠিক হিসেবটি সরকারকে বলতে হবে। আর আমার হিসেব যদি সত্যের কাছাকাছিও হয় সেক্ষেত্রে আমার সরাসরি প্রশ্ন– আসলেই কি আমরা ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে আন্তরিক? নাকি এটাও রাজনীতি– নষ্ট-ভ্রষ্ট রাজনীতি? সময় ক্ষেপণের রাজনীতি? ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মার সাথে বেঈমানী? আমি

আইনজ্ঞ নই, নই বিচার বিশেষজ্ঞ, তবে এটুকু বুঝি যে, ২০১০-১১ সালে ট্রাইব্যুনালে যারা যোগ দিয়েছেন তারা যুদ্ধাপরাধী মামলা পরিচালনে ইতোমধ্যে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। আমার ধারণা ট্রাইব্যুনালের এসব সম্মানিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধানে আরো অনেক-অনেক সংখ্যক ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিষয় নিয়ে ভাবনা অমূলক হবে না। কারণ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজে আমরা ১০০ বছর থেকে ৫০০ বছর পর্যন্ত তো নয়ই ৩৩ বছরও অপেক্ষা করতে পারবো না। এখানে ইতিহাসের একটা শিক্ষা উল্লেখ করতে চাই যা নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উদ্বিগ্ন, এবং আমি নিশ্চিত যারা ভেতরের খবর রাখেন তারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তা হল এই বিচার কাজ যেভাবে এগুচ্ছে সেভাবে এগুলে একসময় উল্টো বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবার সম্ভাবনা অমূলক নয়।

ঐতিহাসিক যে শিক্ষা ও উদ্বেগের কথা এই মাত্র উল্লেখ করলাম তার পেছনে আমার অনেক যৌক্তিক কারণ আছে। এখানে সকলের জ্ঞাতার্থে এবং ভাবনা উদ্রেগের জন্য শুধুমাত্র একটা কারণ উল্লেখ করি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে ট্রাইব্যুনালের রায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ৬ এপ্রিল (২০১৫)। আর সাথে সাথে একই দিনে কোনো কালক্ষেপণ না করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক আন্তর্জাতিক এনজিও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (যার প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৮ সাল, যার ঘোষিত মূল কাজ মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা ও এডভোকেসি এবং যার প্রতিপালনে অর্থের প্রধান উৎস জর্জ সোরোস ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন যারা প্রাক্তন কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে অতিমাত্রায় সক্রিয়) এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড কার্লাইল (যিনি ১৯৯৪ সালে ব্যারিষ্টারি পাশ করেন, ১৯৯৯ সালে লর্ড উপাধি পান, ২০০১-১১ পর্যন্ত সময়কালে সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক আইনি প্রক্রিয়ার সাথে এবং ২০০৮ সালে জাতীয় প্রতিরক্ষার সাথে সম্পৃক্ত, যিনি উইনস্টেই গ্রুপের একজন শেয়ার হোল্ডার এবং মধ্যপ্রাচ্যের কাতার ইনভেষ্টমেন্ট অথরিটি যার ক্লায়েন্ট)— উভয়েই চরমতম মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী যুদ্ধাপরাধী মুহাম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার জন্য সরকার বরাবর আহ্বান জানিয়েছেন। ব্যারিষ্টার লর্ড কার্লাইল সাহেব কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখায় অসন্তোষ প্রকাশ করে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত করার আহবান জানিয়েছেন; ব্যারিষ্টার লর্ড কার্লাইল সাহেব সরকারের প্রতি এ আহ্বানও জানিয়েছেন যে "বাদীপক্ষের কৌসুলির আচরণ বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত, এবং ঐ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের সব বিচারপ্রক্রিয়া স্থগিত রাখা উচিত"। বিশ্বপ্রভূ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের "মানবাধিকার সংস্থা"(!) আর ঐ বিশ্বপ্রভূর উপ-প্রভূ ব্রিটিশ লর্ড সাহেবদের একই সাথে একই সময়ে যুদ্ধাপরাধী বিচারপ্রক্রিয়ার রশি টেনে ধরার উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট অনুধাবনে অন্তত দুটো বিষয় মনে রাখা উপকারী হবে। <u>প্রথমত:</u> নিউইয়র্কভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নামক আন্তর্জাতিক এনজিও-টি তাদের কাগজে কলমে বলে যে তারা আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে পৃথিবীর কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও এডভোকেসি করবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক কোর্টের সিদ্ধান্ত এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে (যে লঙ্ঘনকে বলা হয়েছিল "মানবাধিকার লঙ্ঘন"; "যুদ্ধাপরাধতুল্য", "আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদতুল্য") একক সিদ্ধান্তে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ইরাক দখল করলো, বিনাবিচারে সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করলো, লিবিয়ায় বোমা মেরে দেশটিকে ছিন্নভিন্ন করে ছাড়লো এবং গাদ্দাফিকে বিনা বিচারে হত্যা করলো তখন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর লর্ড কার্লাইল সাহেবরা কোথায় ছিলেন? কোনো টু শব্দটি তো করেন নি, উল্টো এসবে সমর্থন দিয়েছিলেন। একাত্তরের খুনীদের বিচার নিয়ে আমাদের ট্রাইব্যুনাল ও সুপ্রিম কোর্ট যে সব রায় দিচ্ছে সেসব নিয়ে আপনাদের আসলে কোনো কিছু বলার কোনো ধরনের নৈতিক ও মানসিক অধিকারই নেই। <u>দ্বিতীয়ত:</u> বহু বছর ধরে তথ্য প্রমাণসহ আমি বলে আসছি যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী-মানবতা বিরোধী অপরাধীরা বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করতে ইতোমধ্যে বহু ধরনের চেষ্টা করেছে (স্মরণ করুন ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিডিআর-এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড) এবং একই সাথে তথ্য প্রমাণ দিয়েছি যে যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের রাজনৈতিক দল ইতোমধ্যে মার্কিন মুল্লুকে হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে লবিষ্ট নিয়োগ করেছে এ কথা প্রমাণ করতে যে তাদেরকে যেন নিরাপরাধ প্রমাণে বিশ্বব্যাপি তদবির জোরদার করা হয় (ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিষ্ট ফার্ম ক্যাসিডি ইন্টারন্যাশনালের সাথে মির কাশেম আলীর চুক্তি কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?)। মার্কিন মুল্লুকের হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আর ব্রিটিশ লর্ডদের সাথে তর্কে যাবার আমার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে মানুষ হিসেবে ওদের প্রতি আমার একটা সনির্বন্ধ অনুরোধ আছে। অনুরোধটা হল মাত্র দুই মিনিট সময় দিন, দয়া করে পড়ুন একাত্তরের খুনী মু. কামারুজ্জামান যা যা করেছিলো তার মধ্যে মাত্র একটা নমুনা (আশা করি পড়বেন এবং তারপরে যা বলার বলবেন!)। দয়া করে পড়ুন তাহলে কামারুজ্জামানের ফাঁসির রায় বহাল রাখার পরে শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ীর সোহাগপুর গ্রামের বিধবাপল্লীর বাসিন্দা জোবায়দা খাতুনের প্রতিক্রিয়া (পড়ুন, বারবার পড়ুন, যতক্ষণ না বুঝবেন ততক্ষণ পড়ুন):

"আমি তহন ছয় মাসের পোয়াতি (গর্ভবতী)। পাক সেনারা চোখের সামনে গুলি কইরা আমার স্বামীডারে মাইরা ফালায়। জানুয়ারগরের অত্যাচারে পেটের বাচ্চাডাও নষ্ট অইয়া যায়। এরা চইলা গেলে নিরুপায় অইয়া গোসুল ছাড়াই স্বামীরে উডানে (বাড়ির আঙ্গিনায়) কব্বর দিছি। পরে দুই পুলাপান লইয়া অসস্থ সইলে গ্রাম ছাড়ি। কম বয়সে বিধবা অইছি, স্বামীর আদর কি জিনিস বুঝবার পাই নাই। তারাও বুঝব বিধবা অয়নের কি কষ্ট।... স্বামী মইরা যাওয়নের পর ২২ দিন জাউ খাইয়া থাকছি। ভাতের অভাবে মেয়েডা মইরা যায়। পরে অসুস্থ সইল লইয়া বাড়ি বাড়ি কাম করছি। শেষে ভিক্ষা কইরা চলছি। শুধু এই দিনডা দেহুনের লাইগা আল্লাহ আমগরে বাঁচাইয়া রাখছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইব এই খবরেই আমরা বিরাট খুশি অইছি। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমার স্বামী-সন্তানের আত্মা শান্তি পাইব।" একই গ্রামের আরেকজন স্বামীহারা করফুলি বেগম (৭০) বলেন "সাক্ষী দেওয়ার পর থাইকা রাতে ঘরের চালে কে বা কারা ডেল মারত। এলাকার লোকজন ডর (ভয়) দেহাইত। সরকার বইদলা (পরিবর্তন) গেলে নাহি, আমগর উল্ডা বিচার করব। এর লাইগা সবসুমু ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ফাঁসির রায় বহাল থাহায় আমগর মনে স্বস্তি ফিইরা আইছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমগর আত্মা শান্তি পাইব।"

একাত্তরের ২৫ জুলাই সোহাগপুর গ্রামে কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে আলবদর, রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ ও ধর্ষণ করে। বেনুপাড়ার সব পুরুষকে (১৮৭ জন) হত্যা করে পাড়াটিকে পরিণত করা হয় বিধবাপল্লিতে। সেদিন যে ৫৭ জন বিধবা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে জোবায়দাসহ ৩০ জন এখনো বেঁচে আছেন। (দৈনিক প্রথম আলো, ৮ এপ্রিল, পৃ: ২)।

৫। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব: উত্থান, স্বরূপ, বিস্তৃতি, কার্যকরণ, করণীয়

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শুরুতেই 'ধর্ম' (religion) নিয়ে দ্বিবিভাজনমূলক (dichotomous) একটি প্রয়োজনীয় বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ধারণাত্মক দ্বিবিভাজনটা নিম্নরূপ: (১) 'বিশ্বাস হিসেবে ধম' (religion as faith) এবং 'মতাদর্শ হিসেবে ধর্ম' (religion as ideology) এক কথা নয়, (২) 'ধর্মপ্রাণ' ও 'ধর্মান্ধ' এক কথা নয়, (৩) 'ধর্ম বিশ্বাস' ও 'ধর্মীয় গোঁড়ামি' এক কথা নয়, (৪) 'ধার্মিক' ও 'ধর্মান্ধতা' এক কথা নয়, (৫) 'ধর্মভীরু' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতা' এক কথা নয়, (৬) 'ধর্ম' (religion) এবং 'ধর্ম নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি' (perception of religion) এক কথা নয়, (৭) 'ধর্ম প্রবণ' ও 'ধর্মীয় কুসংস্কার প্রবন' এক কথা নয়। ধর্ম, ধার্মিক, ধর্মান্ধতার বহিঃপ্রকাশ এবং সেসব নিয়ে আমাদের ভাবনা-চিন্তা-সিদ্ধান্তকে স্পষ্ট করার কারণে এসব দ্বিবিভাজন নিয়ে আমাদের দেশের সামাজিক বিজ্ঞানী ও ভাষা বিজ্ঞানীদের রীতিমতো গবেষণা জরুরি। দ্বিবিভাজনের এ বিষয়টি ধারণাগত ও নীতিগত উভয় দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথমত, প্রায়শই দ্বিবিভাজনের একটি অংশের সাথে অন্য অংশ সমার্থক মনে করা হয়, ফলে সিদ্ধান্ত হয় ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, দ্বিবিভাজনের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অংশে রূপান্তর সম্ভাবনা থাকলেও বিপরীত সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। তৃতীয়ত, একজন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ এসব দ্বিবিভাজনের কোন অংশে যাবেন তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে তিনি যে সমাজে বাস করেন ঐ সমাজে তার অবস্থা-অবস্থান, তার চিন্তা-ভাবনা থেকে শুরু করে বৈশ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর।

"সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসব নিয়ে আরো এগুনোর আগে স্পষ্ট করা প্রয়োজন প্রত্যয় বা ধারণা হিসেবে (অর্থাৎ as category or concept) 'অ-সাম্প্রদায়িকতা' (secularism) ও 'ধর্ম-নিরপেক্ষতাহীনতা' কি সমার্থক? উভয়েই কি একই অর্থ ধারণ করে? 'সেক্যুলারইজম' বা অসাম্প্রদায়িকতা প্রত্যয়টির উদ্ভব ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও রাজনীতি দর্শনে যার সারবস্তু ধর্মনিরপেক্ষতাহীনতা অথবা ধর্ম-অনিরপেক্ষতা নয়। আমাদের

দেশে 'অসাম্প্রদায়িকতা' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে একই অর্থে দেখা হয়, সমার্থক মনে করা হয়। যেমন আমাদের সংবিধানের বাংলাভাষি সংস্করণে যত জায়গায় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' শব্দটি আছে ইংরেজি তরজমায় ঠিক সেইসব জায়গায় লেখা হয়েছে 'সেক্যুলারইজম' (অর্থাৎ অসম্প্রদায়িকতা)। শুধু তাই নয়, 'কম্যুনালইজম' (communalism) তাহলে কি? কম্যুনালইজমের আভিধানিক অর্থ হলো "বিশেষত কোনো ধর্ম সম্প্রদায়ের উগ্র জাতীয় চেতনা, যা অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার বা সহিংসতার জন্ম দেয়।" আমাদের দেশে "ধর্মভিত্তিক উগ্রতা' কি জাতীয় চেতনায় রূপ নিয়েছে? আমার মতে এসব বিভ্রান্তি শুধু ভাষাগত বিভ্রান্তিই নয় ধারণাত্মক সারমর্মগত ভ্রান্তিও। কারণ একজন মানুষ ধর্মের ভিত্তিতে (বা কারণে) সাম্প্রদায়িক হতে পারেন। আবার সাম্প্রদায়িক হতে হলে " প্রচলিত অর্থের ধর্ম" থাকতেই হবে একথা বিভ্রান্তিকর এবং ভুল। অনুরূপ, কেউ ধর্ম-নিরপেক্ষতাহীন হলে তাকে ধর্মের ব্যবহার করতেই হবে, আবার ধর্মপ্রাণ বা ধার্মিক হলেই যে তিনি ধর্মনিরপেক্ষহীন হবেন– এর কোনটিই স্বতঃসিদ্ধ নয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা-অসাম্প্রদায়িকতা ধর্মনিরপেক্ষহীনতা-ধর্মনিরপেক্ষতা— এসব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী ও সামাজিক বিজ্ঞানীদের অনেক ভাবনা-চিন্তা করতে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্বের স্বরূপ অনুধাবনে প্রথম বলা উচিত যে, ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটা এমনই এক বিশ্বাস যা প্রতিনিয়ত আদর্শিক সংঘর্ষের জন্য তৈরী থাকার প্রেরণা যোগায়। বড় ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। খ্রীষ্ট ধর্ম, ইসলাম, ইহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ এমনকি কনফুসিয়াস অনুসারীদের কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে মতাদর্শের প্রভাব যতটা প্রবল ইসলাম বা ইহুদির বেলায় ততটা জোরালো নয়। সব ধর্মের মৌলবাদীরা নির্দিষ্ট এক ছকের অনুসারী। তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রামের চেতনায় সদা প্রস্তুত। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারনায় বিশ্বাসীদের সাথে মৌলবাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীরা তাদের আদর্শগত এই সংগ্রাম-সংঘর্ষকে প্রচলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বরং তাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধ হচ্ছে শুভ এবং অশুভ শক্তির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী লড়াই। অস্তিত্ব হারানোর প্রচ্ছন্ন এক ভীতি মৌলবাদীদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রায়শ তারা সমাজের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেরা বিকল্প এক চেতনার উদ্ভব ঘটায়। মনোনিবেশ করে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার দিকে। তথাপি মৌলবাদীরা অবাস্তব কোনো ধ্যান ধারণার অনুসারী নয়। তারা তাদের মূল আদর্শকে অনন্য-সাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন মতাদর্শের সূচনা করে। তারা ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মেলে ধরে কর্মপরিকল্পনা। মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীকে সৃষ্টিকর্তার কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে তারা জটিল সব পৌরাণিক কাহিনীকে সর্বজন উপযোগী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মধ্যে তৈরী হয় ক্ষোভ। তারা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসা পরায়ন। [দেখুন Barkat A (2006) "Economics of Fundamentalism and the Growth of Political Islam in Bangladesh" in *Social Science Review*, The Dhaka University Studies, Vol-23, No-2, Dec. 2006].

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা, ইসলাম ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উগ্র রূপ ধারণ করেছে (এসবের কার্যকারণ সূত্র তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে)। মৌলবাদী সাম্প্রদায়িকতা– অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় শক্তির (উপাদানের) মাধ্যমে 'অর্থনৈতিক ক্ষমতা-ভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া'কে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করে সুসংগঠিত জঙ্গি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে উদ্যত। তারা সৃষ্টি করেছে মূল ধারার রাষ্ট্রের মধ্যে আরেকটি রাষ্ট্র, মূল ধারার সরকারের মধ্যে আরেকটি সরকার, মূল ধারার অর্থনীতির মধ্যে আরেকটি অর্থনীতি। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলন-উদ্ভূত এক দর্শন, যা ধর্মকে রাজনৈতিক মতাদর্শে রূপান্তরিত করে; আর ধর্ম-ভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

উল্লেখ্য যে ঐতিহাসিকভাবে পূর্ববাংলায় ইসলাম ধর্ম যখন উদারনৈতিক ও মানবিক প্রকৃতির তখন সমসাময়িককালে এদেশের অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতিতে এমন কি পরিবর্তন ঘটেছে যার ফলে এখানে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা এমন জঙ্গি রূপ নিচ্ছে— জোরদখল করতে চায় সবকিছু। কি সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি যার উপর ভর করে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা পুষ্ট হচ্ছে? তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত কত শক্ত, কত সুদৃঢ়? উগ্র সাম্প্রদায়িকতা কতদূর বিস্তৃত হবার ক্ষমতা রাখে— পারবে কি তা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে? ১৭ আগস্ট ২০০৫-এ "গায়ের জোরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে" বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা

বিষয়টি আর নেহায়েত 'সমস্যা' পর্যায়ে নেই, তা উত্তরিত হয়েছে 'সংকটে'। গুণগত দিক থেকে সাম্প্রদায়িকতার উত্থানে এ এক নূতন পর্যায়। আর ১৯৭১-এর মানবতা বিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রমসহ শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চে প্রগতিবাদী তরুণ প্রজন্মের আলোকিত-আন্দোলন মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থানকে আরো এক ধাপ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। চ্যালেঞ্জটি তারা গ্রহণ করেছে আপাতত "হেফাজতে ইসলাম"-এর ব্যানারে। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদের অনগ্রসর-পশ্চাৎপদ দৃষ্টিভঙ্গি দেশকে হাজার বছর পিছিয়ে দিতে পারে। কারণ সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ যুক্তির ধার ধারে না, অন্ধকারই তার যুক্তি-ভিত্তি। আর তাই দেশ বাঁচাতে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের গতি রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের অর্জন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের চেতনায় জনকল্যাণকামী এক সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ এ দেশের জনগণের সুদৃঢ় ঐক্যভিত্তিক সুসংগঠিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কর্মকাণ্ডের আর কোনো বিকল্প নেই। সৃজনশীল এ কর্মযজ্ঞে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

ইসলাম ধর্মভিত্তিক (সঠিকভাবে বললে বলা উচিত 'ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করে') মৌলবাদ ও সংশ্লিষ্ট জঙ্গিবাদের উত্থানের সাথে সাম্রাজ্যবাদী সিস্টেমের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। গত শতাব্দির প্রথমার্ধে সমাজতন্ত্রের উত্থান আর শেষের দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভাঙ্গন-পরিবর্তন, উন্নত পুঁজিবাদি দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসি মনোভাবের স্পষ্ট প্রকাশ, পৃথিবীর এক মেরুয়ায়ন আর বিশ্বায়নের ডামাডোল ধর্ম-ভিত্তিক মৌলবাদের উত্থানে গতি বৃদ্ধি করেছে। মৌলবাদের উত্থান ত্বরান্বয়নে সাম্রাজ্যবাদ কোথাও প্রধান ভূমিকা পালন করেছে (তালেবানইজম, আল-কায়েদা, মোল্লা ওমর, বিন লাদেন কাদের সৃষ্টি?), আবার কোথাও স্বার্থ উদ্ধারের পরে তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এসবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত হয় মুনাফা সমীকরণ দিয়ে (এসব সম্পর্কিত রাজনৈতিক অর্থনীতির সূত্র তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিশ্লেষিত হয়েছে)। সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের সাথে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতির উত্থান ও বিকাশ যেমন সাযুজ্যপূর্ণ তেমনি সাম্রাজ্যবাদের অধিকতর বিকাশের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট ধরনের মৌলবাদ প্রতিবন্ধকতার কারণ হলে তা প্রতিস্থাপিত হবে অন্য রূপের সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে— এটাও লক্ষণীয় (যেমন ইসলামিক স্টেট)। তেল-গ্যাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পানি সম্পদের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত অর্থনীতি, বিশ্ব বাজারে (তথাকথিত 'অবাধ বাজার' আর বিশ্বায়নের নামে) কর্তৃত্ব স্থাপনের রাজনৈতিক অর্থনীতি, মহাকাশের সামরিকীকরণ— বর্তমান যুগে এসবই মৌলবাদের সাথে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার অন্যতম অনুষঙ্গ।

বহিঃস্থ (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal) উভয় উপাদানই ধর্মের উদ্ভবসূত্রের উদারনৈতিকতার বিপরীতে সংকীর্ণতা বিকাশে ভূমিকা রাখে যার ফলে 'ধর্মকে ব্যবহার করে' মৌলবাদী অন্ধত্ব থেকে শুরু করে সশস্ত্র জঙ্গিবাদ পর্যন্ত সৃষ্টি সম্ভব হয়। একদিকে বিশ্ব অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী ডলার অর্থনীতির বিপর্যয়, বিশ্ববাজারে পেট্রোডলারের বাড়-বাড়ন্ত ও অস্থিরতা, সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান আক্রমণ, ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ভেঙ্গে ফেলা এবং পরবর্তীতে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের (War on terrorism) নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভূদের অযৌক্তিক অতি-প্রতিক্রিয়া এবং তার সাথে মার্কিন হোঁতা সাম্রাজ্যবাদের অধীন উপ-সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের স্বার্থ-সম্মিলন, "উন্নত" বিশ্বে মুসলমান নামধারীদের প্রতি প্রকাশ্য সন্দেহ-অবিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র-যুক্তরাজ্যের বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেলভাণ্ডার সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশ ইরাক আক্রমণ ও দখল, আফ্রিকায় তেলসমৃদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ দেশ লিবিয়া দখল, গোলাকায়নের গোলকধাঁধায় ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মিথ্যাচার ও অপসংস্কৃতি প্রচার, আর অন্যদিকে আমাদের দেশে রেন্ট সিকার পরিচালিত দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর বহুমুখী দারিদ্র্য-বৈষম্য-অসমতা বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন জীবনে মানুষের ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দুর্দশা-বিপন্নতা-অসহায়ত্ব-বঞ্চনাবোধ-বিচ্ছিন্নতাবোধ-হতাশা-নিরাশা— এসব কিছুই ধর্মের উদার ধ্যান-ধারণার বিপরীতে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় অবদান রেখেছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে (এবং অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকবে)। এসব সুযোগ ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির চাহিদা বৃদ্ধিতে সহায়ক, আর সে চাহিদা পূরণেই মৌলবাদী অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতির উদ্ভব বলা যায়। এ দু'টি একে অন্যের পরিপুরক— যৌথভাবে তাদের মুল লক্ষ্য 'ধর্মের নামে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল'।

আগেই বলেছি ধর্ম যদি শুধুমাত্র বিশ্বাসের বিষয় হয় (অর্থাৎ religion as faith not as ideology) সেক্ষত্রে ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ-জঙ্গিবাদ উদ্ভবের যুক্তিগত কোনো কারণ নেই। এ কথা বলছি এ জন্য যে, এদেশে ইসলাম ধর্মের মূল প্রচারকেরা অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামারা বিগত প্রায় এক হাজার বছর ধরে কোনো উগ্র ধর্মীয় আচার প্রচার করেননি; এমন কি তাঁরা তা সমর্থনও করেননি। উল্টো তারা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রচারের স্থানটিকে (যেমন মাজার,

মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি) রেখেছিলেন আয়তনে ছোট, আর বড় করেছিলেন পশ্চাৎপদ অঞ্চলে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি কাজের এলাকা। পশ্চাৎপদ এলাকার এ সব বন-জঙ্গল তারা পেয়েছিলেন অনুদান হিসেবে। অর্থাৎ তারা মানুষকে সম্পৃক্ত করেছিলেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, মূলতঃ কৃষি কাজে। সেই সাথে সুফিরা যত না অন্য ধর্মের মানুষকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডে। "আশরাফুল মাখলুকাতের সেবাই ধর্ম"— এ তাদেরই কথা। আশরাফুল মাখলুকাতের অর্থ মুসলমান নয় এর অর্থ সৃষ্টির সেরা জীব অর্থাৎ মানুষ। সুফিরা কখনও কোথাও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান বা অন্য কোনো ধর্মের উপাসনালয় ভেঙ্গেছেন অথবা অনুরূপ কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করেছেন ইতিহাসে এমন কোনো নজির নেই। সুফি-সাধক-ওলামারা ইসলাম ধর্মের মতাদর্শের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ডের সম্মিলন ঘটিয়েছিলেন। মানুষের শ্রম ও শ্রম উদ্ভূত ফসল এবং এমনকি শ্রম-উদ্ভূত ফসলের ন্যায্য বণ্টন যেন হয়– এসব কথা সুফিরা প্রচার করেছেন। এখানে স্পষ্ট বলা দরকার যে, পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশে তরবারি, অভিবাসন অথবা পৃষ্ঠপোষকতার তেমন কোনো ভূমিকা নেই (যা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসূহের জন্য পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য)। আমাদের দেশে ইসলাম বিকশিত হয়েছে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা বিকাশের অনুষঙ্গ হিসেবে। এ দেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্মের সুফি-সাধক-ওলামারা সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশবাদ বিরোধি লড়াই-সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন; এমনকি নেতৃত্বও দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সুফি-সাধক-ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই তা করেছেন। তাঁরা ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধেও বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। সুফি-সাধক-ওলামারা মনে করেন "ধর্মকে রাজনীতিতে আনা নিষিদ্ধ এবং যারা তা করেন তারা ইসলাম ধর্ম বিরোধী"; তাঁরা স্পষ্ট বলেন "ভাববাদী ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে ধর্মান্ধতার ব্যবসা করা ধর্মবিরোধী", তাঁরা এও মনে করেন "জামায়াতে ইসলামের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত"; তারা এও জোর দিয়ে বলেন যে "হেফাজতে ইসলামের তেতুল হুজুর ইসলাম ধর্ম বিকৃতকারী সুতরাং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন"; তাঁরা বলেন "চরিত্রহীন আলেমের সংসর্গ হতে চরিত্রবান দুনিয়াদারী লোকের সংসর্গ অনেক ভালো"; তাঁরা গণজাগরণ মঞ্চে জনসম্মুখে তাদের বক্তব্যে বলেছেন "১৯৭১ এ যারা মানব অধিকার লঙ্ঘন করেছে, গণহত্যা সংঘটিত করেছে এবং যুদ্ধাপরাধ করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত" ইত্যাদি। সুফি-সাধক ওলামারা ধর্মের উদারনৈতিক-অসাম্প্রদায়িক মানবিক যুক্তি ব্যবহার করেই এসব করেছেন এবং বলেছেন। সুতরাং বিশ্লেষণ এটাই প্রমাণ করে যে উদ্ভব সূত্রে এ দেশে ইসলাম— মানবতাবাদী, উদারনৈতিক ও সেক্যুলার। অর্থাৎ সুফি-সাধক-ওলামাদের প্রভাবে এ দেশের মুসলমানেরা ঐতিহাসিকভাবেই প্রগতিবাদী এক পজিটিভ জীবন-কোষ, ডিএনএ-র বাহক। যৌক্তিক কারণেই আমাদের দেশে ইসলাম ধর্মের এ পজিটিভ ডিএনএ-র কারণেই সশস্ত্র জঙ্গিত্ব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না। তবে এ নিয়ে আত্মতুষ্ট হলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক।

বিগত ১০০ বছরে যখন বৃটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বৃটিশরা 'বিভক্ত করে শোষণ কর' নীতির ভিত্তিতে ধর্মকে ব্যবহার করে ভারতবর্ষ বিভাজনের উদ্যোগ নিল তখন থেকেই এ উপমহাদেশে ধর্মভিত্তিক বড় মাপের বিপর্যয়ের বীজ রোপিত হয়ে গেলো। বলা যায় এখান থেকেই শুরু উদ্ভব সূত্রে উদারনৈতিক, সেক্যুলার মানবতাবাদী ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ইসলামে (Political Islam) রূপান্তর পর্ব। এ প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলায় ইসলাম ধর্মের ইতিহাসে বড় মাপের <u>প্রথম পশ্চাদমুখী রূপান্তর</u> (বিপর্যয়) ঘটেছে গত শতাব্দিতে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গ এলো— অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান আর হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান। সাম্প্রদায়িক ধর্ম-ভিত্তিক দেশ বিভাজনে ইসলাম ধর্মের উদারনৈতিক-মানবিক ধারার সুফি-সাধক-ওলামারা বাধা দিতে পারলেন না। তারা সংগঠিত ছিলেন না। মূল ধারার বিপরীতে পশ্চাদমুখী এ রূপান্তর (regressive transformation) হঠাৎ ঘটেনি— এর পিছনে ব্যবহৃত উদারনৈতিক কিন্তু কার্যত ধর্মান্ধতার এক সুনির্দিষ্ট ধারা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। যেমন ওহাবি ধারা, যারা ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের এক পর্যায়ে মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠলো। ফলে ইসলাম ধর্মের মানবকল্যাণকামী সুফি-সাধক-ওলামা চেতনা পেছনে পরে গেলো, আর ঋণাত্মক উত্তরণ ঘটে এতদিন যা ছিলো উদারনৈতিক-মানবতাবাদী তা রূপান্তরিত হলো সংকীর্ণ জঙ্গিত্বে; উদ্দেশ্য ছিল সংকীর্ণ স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। অর্থাৎ ধর্ম-ভিত্তিক পাকিস্তান সৃষ্টির সাথে সাথে এদেশে ইসলাম ধর্মের বিকাশে এক নূতন প্রবণতা সৃষ্টি হল: কৃষি উন্নয়নের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা থেকে ধর্মভিত্তিক সশস্ত্র মৌলবাদ ধারণাপুষ্ট রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রবণতা। পাকিস্তানে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার এ ধারা এতই প্রবল হলো যে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সব হিন্দুদের হিন্দুস্থানী বানাতে তৎকালীন সামন্ত-সেনা-স্বৈরশাসকদের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ও লাগেনি— জরুরি অবস্থার অজুহাতে জারি করলেন "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act) যেখানে হিন্দু মাত্রেই শত্রু (সে দেশে

অবস্থানকারী হিন্দুই হোক না কেন) । রাষ্ট্র-পরিতোষিত ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার এমন নমুনা পূর্ব বাংলার ইতিহাসে এর আগে কখনো দেখা যায়নি ।

জন্মসূত্রেই পাকিস্তান রাষ্ট্র ধর্মাশ্রয়ি । পাকিস্তান রাষ্ট্রের পুরো সময়টা (১৯৪৭-৭১) রাষ্ট্র পরিচালন এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে । যে কোনো রাজনৈতিক-সামাজিক সংকট উত্তরণে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে— বিপদাপন্ন হলেই বলা হয়েছে "ইসলাম বিপন্ন" ('ইসলাম খত্‌রে মে হ্যায়') ; মিলিটারি শাসন ও স্বৈরাচার বলবৎ রাখতে "ইসলামের বিপন্নতা"ই ছিল একমাত্র শ্লোগান । সবশেষে সারবস্তুহীন "ইসলামের বিপন্নতা" শ্লোগানটি ব্যবহৃত হয়েছে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে 'পাকিস্তানকে বাঁচাতে' পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়েছিল পাঞ্জাবি-সিন্ধি-বেলুচ সৈন্য (অবশ্য এদেশে এসে তাদের অনেকেই ভিন্ন চিত্র দেখেছেন এবং পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠির ধোঁকাবাজি ও মিথ্যাচার বুঝতে পেরেছিলেন); ঐ একই শ্লোগান 'ইসলাম বিপন্ন' ব্যবহৃত হয়েছে এদেশে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কিছু সংখ্যক মুসলমান নিয়ে শান্তি কমিটি, আল বদর, আল শামস, রাজাকার, ফৌজে এলাহি, মুজাহিদসহ বিভিন্ন নামে বাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায় । এরা নিশ্চিত ছিল যে মুক্তি-স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীরা পরম-পরাক্রমশালী পাকিস্তানি নিয়মিত সেনাবাহিনী ও তাদের সশস্ত্র সহযোগী দালাল-দোসর রাজাকার-আলবদর-আল শামসদের কাছে পরাজিত হবে । ঘটলো উল্টোটা । অনেক রক্ত, ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি । তবে দীর্ঘ ৪০ বছর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের কোনো ধরণের শাস্তির বিধান তো করতেই পারিনি । আর একই সাথে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কালক্ষেপণ না করে মোশতাক-সায়েম-জিয়ার অবৈধ সরকার সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে' সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছে । এসবই পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক শক্তিসহ দেশি-বিদেশী সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঔদ্ধত্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে । ঐ ধর্ম-পুঁজির ব্যবসায়ী গোষ্ঠি এবং উগ্র-সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কিছু অনুসারীরাই বাংলাদেশে মৌলবাদি রাজনৈতিক-অর্থনীতির প্রতিভূ । এদেশে ধর্মের ইতিহাসে এ এক চরম বিকৃতিকাল– বলা যায় ইসলাম ধর্মের পশ্চাদমুখী রূপান্তরের দ্বিতীয় কালপর্ব । আর বলা যায় "হেফাজতে ইসলাম" হলো দ্বিতীয় কালপর্বের মোটামুটি প্রাক-চূড়ান্ত রূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র । এ দেশে ইসলাম ধর্মের ঐতিহাসিক মূল ধারার (সুফিবাদ) বিকাশের সাথে বর্তমান মৌলবাদি রাজনীতি-অর্থনীতির বিপরীতধর্মী পার্থক্যটা এখন স্পষ্ট ।

এদেশে ঐতিহাসিক উদ্ভবসূত্রে সকল ধর্মই দেশের মাটি উত্থিত এবং উদ্ভবসূত্রে উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী । ইসলাম ধর্মও ব্যতিক্রম নয় । আগেই বলেছি ঐতিহাসিকভাবেই পূর্ববাংলায় উদ্ভবসূত্রে ইসলাম ধর্ম ছিল উদারনৈতিক, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িক । কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার ফাঁদে পড়ে কালানুক্রমে তা "রাজনৈতিক ইসলামে" (Political Islam) রূপান্তরিত হয় । এদেশে ইসলাম ধর্মের বড় মাপের পশ্চাদমুখী রূপান্তর (regressive transformation) ঘটে দুই সময়কালে । প্রথমটি ঘটে "দ্বিজাতি তত্ত্বের" ভিত্তিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে যখন ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন হলো তখন (অর্থাৎ ১৯৪০-এর দশকে শুরু হয়ে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত), আর দ্বিতীয় পশ্চাদমুখী বিপর্যয় ঘটে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে যখন আমরা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও রাজনৈতিক দলকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধের জন্য শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলাম এবং প্রায় একই সময়ে বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম অর্জন দেশ-সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণে অন্যতম গণ-আকাঙ্ক্ষা "ধর্মনিরপেক্ষতা" (যা ছিল আমাদের প্রথম সংবিধান— ১৯৭২-এর সংবিধানের অন্যতম মূল নীতি)-কে অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৮ সালে চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন (দেখুন, Second Proclamation Order No. VI of 1978) । ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার উত্থান কাজটি জিয়াউর রহমান শুরু করেন ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত "দালাল আইন"টি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৫-এ বাতিল ঘোষণা করে । ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে যতটুকু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা উল্লেখ ছিলো সবকিছুই অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭-৭৮ সালে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত ঘোষণা করে তার জায়গায় "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" সংযোজন করে ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পথ সচেতনভাবেই সুপ্রশস্ত করলেন । ১৯৭২-এর বঙ্গবন্ধু সরকার প্রণীত মূল সংবিধানের সাথে অবৈধ প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘোষিত দ্বিতীয় ঘোষণা (সংশাধনী) অর্ডার ১৯৭৮ [Second Proclamation (Amendment) Order, 1978) তুলনা করলেই বুঝতে কোনোই অসুবিধা হয় না যে জিয়াউর রহমানই ছিলেন ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের পুরোধা ব্যক্তি । অবৈধ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭২-এর মূল সংবিধান অবৈধ যেসব পরিবর্তন আনলেন তার মধ্যে অন্যতম হল

নিম্নরূপ: (ক) সংবিধানের প্রস্তাবনার প্রথম অনুচ্ছেদে "জাতীয় মুক্তি" শব্দের জায়গায় বসালেন "জাতীয় স্বাধীনতা", আর "ঐতিহাসিক সংগ্রামের" জায়গায় বসালেন "ঐতিহাসিক যুদ্ধের" শব্দ; (খ) প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতার" পরিবর্তে লিখলেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস"; শুধু তাই নয় ১৯৭২-এর সংবিধানে যেখানে সংবিধানের চার মূল নীতির মধ্যে চতুর্থ স্থানে ছিল "ধর্মনিরপেক্ষতা" সেখানে পরিবর্তিত সংবিধানে "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দ বিলুপ্ত করে চার মূলনীতির প্রথম স্থানে বসালেন "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ; (গ) মূল সংবিধানের ৮ (১) অনুচ্ছেদে "ধর্মনিরপেক্ষতাকে" প্রতিস্থাপিত করা হল "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস" শব্দসমূহ দিয়ে; আর ৮ (২) অনুচ্ছেদে "এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূল সূত্র হইবে"-র জায়গায় অন্তর্ভুক্ত করলেন নতুন বাক্য "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি" (ঘ) মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০ যেখানে শোষণমুক্ত, ন্যায়ানুগ, সাম্যবাদী সমাজ, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ ছিল তা সম্পূর্ণ বাতিল করলেন; (৪) সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষণা করলেন মূল সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ যেখানে বলা হয়েছিল "ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ধর্মের অপব্যবহার, কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে"; (চ) মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ যেখানে সুস্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না"— জিয়াউর রহমান সংবিধান থেকে এসব সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে ছাড়লেন। এসবই একদিকে যেমন স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আজ যে ইসলামভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, মৌলবাদের অর্থনীতি, মৌলবাদের রাজনীতি, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আমরা দেখছি — এসব কিছুরই মূলে ছিল অবৈধ ক্ষমতায় স্বৈরাচারী ও চরম বিশ্বাসঘাতক প্রেসিডেন্ট মেজর জেনালের জিয়াউর রহমান। এসব করে জিয়াউর রহমান মহান মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত সংবিধানের মৌলিক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যই পাল্টে দিলেন এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা উল্টে দিয়ে রাষ্ট্রদ্রোহ তুল্য অপরাধ করলেন। এহেন অবস্থায় যে কেউই যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন উত্থাপন করতেই পারেন যে জিয়াউর রহমানের মতাদর্শে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল কিনা, নাকি তিনি পাকিস্তান পন্থী দালাল ছিলেন? প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতেই পারে যে জিয়াউর রহমান প্রজাতন্ত্রের মূল সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর দৃশ্যমান মূল নেতাদের গোপন মূল নেতা ছিলেন কিনা? এ প্রশ্নও উত্থাপন আদৌ অযৌক্তিক হবে না যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানের চার মূল নীতির অন্যতম নীতি ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন কিনা? খুব যৌক্তিক হবে যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন যে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদ করে জিয়াউর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে "ইসলামী বাংলাদেশে" অথবা "বাংলাদেশের পাকিস্তানীকরণের" মূল স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন কিনা? আরো মারাত্মক প্রশ্ন হতে পারে এমন যে অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি উচ্ছেদকারী জিয়াউর রহমান কি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন (Freedom fighter by choice) নাকি ঘটনাচক্রে মুক্তিযোদ্ধা (Freedom fighter by chance) ছিলেন, নাকি মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের চর ছিলেন (spy of anti-liberation forces)। আমি তো আরো মারাত্মক ও আরো ভয়াবহ উপসংহারে উপনীত হতে পারি যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বপ্রভুত্ব কায়েমের লক্ষ্যে তার মহাকৌশলের (grand strategy) অংশ হিসেবে বিশ্বের তেল ভাণ্ডার (যা প্রধানত মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে কেন্দ্রিভূত) জবরদখলের উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রকামী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিলো এবং যারই অংশ হিসেবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিলো যে হত্যাকাণ্ড যারা ঘটিয়েছিলেন তাদের হোঁতা ছিলেন জিয়াউর রহমান। যে জিয়াউর রহমানকে দিয়েই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রথমে গায়ের জোরে (একে বলে "থুকোডাইডিস নীতি" ও "মন্‌রো মতবাদ") সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল করে সাম্প্রদায়িকতা— ইসলাম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলো এবং একই সময়ে অসংখ্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল; আর সেটা করেছিলো মৌলবাদী জঙ্গিত্ব উত্থানের পূর্বশর্ত হিসেবে যার ফলে ঘটনার শুরুর ৩০ বছর পরে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে "মডারেট মুসলিম দেশের" তকমা জুড়ে দিয়ে পরবর্তী কোন এক সময়ে রাষ্ট্র ক্ষমতাটাই জঙ্গিদের হাতে তুলে দিয়ে ইসলামী জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র খেতাব দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদসমৃদ্ধ এবং ভৌগোলিক-রাজনৈতিক কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ দেশ বাংলাদেশকে দখল করা যায়। যদি আমার এ উপসংহার সঠিক হয় তাহলে মুক্তিযোদ্ধা(?) জিয়াউর রহমান আসলে কে? কি তার প্রকৃত পরিচয়? ইতিহাস কিভাবে তাকে ক্ষমা করবে? তার দলই বা এ ফাঁদ থেকে কিভাবে বেরুবে?

পৃথিবীর অনেক দেশেই ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠির উত্থান ঘটেছে। তবে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই ঐ মৌলবাদী শক্তির নিজস্ব দেশজ অর্থনৈতিক ভিত্তি নেই অথবা থাকলেও তা দুর্বল। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্নতর— এখানে মৌলবাদী গোষ্ঠি পরিকল্পিতভাবেই তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলেছে। এ ভিত যথেষ্ট শক্তিশালী এবং বহুমুখী। এ ভিত সৃষ্টিতে পুঁজির আদি সঞ্চয়ন হিসেবে কাজ করছে মৌলবাদী অর্থনীতির স্রষ্টাদের ১৯৭১-এ জনগণের সম্পদের হরিলুট ('গনিমতের মাল লুট') আর পরবর্তীতে তার সাথে প্রত্যক্ষ যুক্ত হয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অর্থপুঁজি এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ দেশের সম-মতাদর্শিক পুঁজি বিনিয়োগ। মৌলবাদের অর্থনীতির এ ভিত দুর্বল নয় সবল এ কারণেও যে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সামন্তবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ক্ষয় হয়েছে, কিন্তু একদিকে যেমন চিরাচরিত সামন্তবাদী মানস কাঠামো বিলুপ্ত হয়নি তেমনি অন্যদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কও বিকশিত হয়নি; বিকশিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিকৃষ্ট পুঁজি, যা উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ভূমিকা রাখে না। উল্লেখ্য যে, "ব্রিফকেস পুঁজিবাদ" বিকাশে শিল্প-ভিত্তিক চিরায়ত পুঁজিবাদের তুলনায় "শকুন পুঁজিবাদ" (vulture capitalism) অনেক বেশি অনুকূল। এই পুঁজিবাদ উৎপাদনশীল শিল্প নির্ভর অর্থনীতির চেয়ে নগরভিত্তিক ভূমি-ব্যবসা এবং দোকানদারী অর্থনীতি বিকাশে অনেক বেশি উৎসাহী। অর্থাৎ কাঠামোগতভাবেই এই পদ্ধতি উদ্বৃত্ত শ্রমের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারছেনা। হচ্ছে না প্রকৃত অর্থের দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৈষম্য-অসমতা হ্রাস; উল্টো— বৈষম্য-অসমতা ক্রমবর্ধমান। অবশ্য মুক্তবাজার অর্থনীতি কখনোই দরিদ্র-বান্ধব নয়; রেন্ট সিকার অধ্যুষিত আমাদের দেশে তো নয়ই। একচেটিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুক্তবাজার এদেশের জাতীয় পুঁজি-ভিত্তিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার বদলে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে সেটাও মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ও তার পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট মাত্রায় সহায়ক-প্রভাবক। আবার কাঠামোগত রূপান্তরের নিরিখে স্বাধীনতা উত্তর চার দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি যা দিয়ে বলা যাবে যে, স্বাধীনতার মানবকল্যাণমুখী চেতনা বাস্তবায়িত হয়েছে। সুস্থ-সবল-ভেদ-বৈষম্যহীন-আলোকিত মানুষ সৃষ্টিই ছিল স্বাধীনতার মূল আকাঙ্ক্ষা। ঐ আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার দূরত্ব ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান। আকাঙ্খা ও বাস্তবতার ক্রমবর্ধমান এ ফারাকটাও ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদ তোষণে সহায়ক।

বাস্তব তথ্য বিশ্লেষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ক্ষমতাহীন মানুষ (কর্মসংস্থান ও জীবনযাত্রার সূচক-সংক্রান্ত সরকারি অতি-আশাব্যঞ্জক পরিসংখ্যান ও প্রচার যা-ই বলুক না কেন) অতিকষ্টে জীবন যাপন করছেন। আশা করি, সত্যনিষ্ট আপনাদের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এদেশে মোট জাতীয় আয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠির হিস্যা উত্তরোত্তর কমেছে, আর ধনীদের বেড়েছে— ধনী-দরিদ্র ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের একথাটা কিন্তু সরকারিভাবেই স্বীকৃত। অবশ্য সরকার নির্বিশেষে এক ধরনের দালাল-স্তাবক আছেন যারা হয় এসব বিশ্বাস করেন না অথবা একটু একটু বিশ্বাস করে এসবের মধ্যে 'ধাঁধাঁ' (puzzle) খুঁজতে থাকেন (আসলে তারা নিজেরাই puzzled)। মনে রাখা প্রয়োজন যে, গত ৪০ বছরে এ দেশে বিভিন্ন মানদণ্ডে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি থেকে বেড়ে এখন ১০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে (অবশ্য সরকার তা স্বীকার করে না), আর সেই সাথে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। বিকাশ প্রবণতা যা তাতে দেখা যায় নিকট অতীতের দরিদ্ররা দরিদ্রই থাকছেন, আর নিম্নবিত্ত হচ্ছেন দরিদ্র, সেই সাথে মধ্য-মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ হয় নিম্ন-মধ্যবিত্তে অথবা এক লাফে দরিদ্রে রূপান্তরিত হচ্ছেন। একই সময়ে অর্থনীতি, রাজনীতি, আর শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রসহ সর্বত্র এক আত্মঘাতী লুণ্ঠন সংস্কৃতি জেঁকে বসেছে। এই লুণ্ঠন সংস্কৃতির চরিত্র-নিয়ামক হ'ল কালো টাকা, সন্ত্রাস, অবৈধ অস্ত্র, পেশি শক্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, কুশাসন-অপশাসন, দমন-পীড়ন নির্যাতন-নিবর্তন, অত্যাচার, অবিচার ইত্যাদি। এসবই ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও মৌলবাদের অর্থনীতি গঠনের অন্যতম সহায়ক উপাদান। আর এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বপ্রভুত্ব, পাকিস্তান ফ্যাক্টর, মধ্যপ্রাচ্য ফ্যাক্টর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সক্রিয় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছে ও করছে।

শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণ মৌলবাদের শক্তি বৃদ্ধিতে সরাসরি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে ও করছে: গত তিন দশকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসা বেড়েছে ৮ গুণ; প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বেড়েছে দ্বিগুণ আর দাখিল মাদ্রাসায় বেড়েছে ১৩ গুণ; সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক পর্যায়ে একজন ছাত্রদের মাথাপিছু রাষ্ট্রীয় ব্যয় যেখানে ৩ হাজার টাকা, সরকারি মাদ্রাসা খাতে তা ৫ হাজার টাকা। মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে যে, বাংলাদেশে এখন প্রতি ৩ জন ছাত্রের ১ জন মাদ্রাসার ছাত্র (যার মোট সংখ্যা হবে ৮০ লক্ষ); দেশে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা হবে ৫৫,০০০-এর বেশি, যার মধ্যে ৭৩ শতাংশ কওমি মাদ্রাসা; এসব মাদ্রাসা পরিচালনে বছরে ব্যয় হয় আনুমানিক ১,৪০০ কোটি টাকা, আর মাদ্রাসা পাশদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৭৫ শতাংশ

(বিস্তরিত দেখুন, আবুল বারকাত ও অন্যান্য, বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার রাজনৈতিক অর্থনীতি: উদ্ভব, বিকাশ ও অভিঘাত)। শিক্ষার সাম্প্রদায়িকীকরণের অভিঘাত ও প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে যে অধিকাংশ মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র পরিবার থেকে আগত। ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গি আত্মঘাতি বোমাবাজদের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই ধরনের ধারণা-কাঠামো প্রযোজ্য।

অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এবং গরীব ও মধ্যবিত্তের স্বার্থবিরোধী রাজনৈতিক-অর্থনীতি নির্ভর উন্নয়ন ধারা বাংলাদেশে গ্রাম ও শহর অঞ্চলের শ্রেণি কাঠামো বদলে দিয়েছে। আর্থ সামাজিক শ্রেণি কাঠামো যেভাবে বদলেছে তা সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদ বিকাশে **পুরো মাত্রায়** অনুকূল। বাংলাদেশে চলমান আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর পরিবর্তনের এই ধরন সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য এবং মধ্যবিত্তের বেহাল দশাকেই নির্দেশ করে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গত ২৫ বছরে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্য অবস্থার অধোগতি হয়েছে। সেই সাথে দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্নগামী প্রবণতা এবং মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিম্ন-মধ্যবিত্তের দিকে ধাবিত হওয়া, নিম্ন-মধ্যবিত্তের গতি দরিদ্র মুখী আর সম্পদ পুঞ্জিভূত হচ্ছে কিছু ধনীক শ্রেণির মানুষের হাতে (যারা মোট জনসংখ্যার ২.৭ শতাংশ, আবার যাদের ১০ শতাংশ দখল করে আছে ধনীদের ৯০ শতাংশ সম্পদ এরা হলেন সুপার-ডুপার ধনী রেন্ট সিকার)। এক দিকে এই প্রকট গণদারিদ্র্য এবং ব্যাপক অসমতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা এবং নগণ্য সংখ্যক মানুষের হাতে অঢেল সম্পদ— এসবই বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতাসহ উগ্র মৌলবাদ উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের শক্তিশালী অনুকূল পরিসর সৃষ্টি করেছে। শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ প্রবণতার বিশ্লেষণে এ উপসংহারে উপণীত হওয়া সম্ভব যে যদিও কয়েক শতাব্দির ঐতিহাসিক বিকাশ এ দেশে অর্থনীতির সাম্প্রদায়িকীকরণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে না তথাপি গত সাত দশকের (ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমসাময়িককাল থেকে) মানব কল্যাণবিমুখ উন্নয়ন ধারা মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ়করণের সকল শর্ত সৃষ্টি ও সম্প্রসারিত করেছে। আর বিশ্বায়নসহ বহিঃস্থ অনেক উপাদানই (external factors) এ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক শক্তির কাঙ্খিত বিকাশ ত্বরান্বিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী ১৯৭৫ থেকেই রাষ্ট্রক্ষমতায় ঘুরে ফিরে এসেছে স্বৈরতন্ত্র অথবা কালো টাকার স্বার্থবাহি সংসদ যা প্রকৃত অর্থে রেন্ট সিকারদেরই আজ্ঞাবাহি । দুর্বৃত্তায়িত হয়েছে অর্থনীতি, আর তা রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের নিদের্শকসমূহ নিম্নরূপ: গত চার দশকে বাংলাদেশে সরকারিভাবে যে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক ঋণ-অনুদান এসেছে তার ৭৫ শতাংশ লুট করেছে দুর্বৃত্তরা (যাদের সংখ্যা আসলে ২ লক্ষ আর পরিবার-পরিজনসহ ১০ লক্ষ মানুষ); এরা এখন বছরে প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ কালো টাকা সৃষ্টি করে (যার ক্রমপুঞ্জিভূত পরিমাণ হবে ৬-৭ লক্ষ কোটি টাকা); এরাই বছরে ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ অবৈধ অর্থ পাচারের (money laundering) সাথে সম্পৃক্ত; এরাই বছরে ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার ঘুষ-দুর্নীতির সাথে জড়িত; এরাই প্রায় ৩০-৪০ হাজার কোটি টাকার ঋণখেলাপি; এরাই সবধরণের বড় মাপের অবৈধ অস্ত্র ও ড্রাগ ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত; এরা দেশের কমপক্ষে ১ কোটি বিঘা খাস জমি ও জলাভূমি অবৈধভাবে দখল করে আছে; এরাই উপকূলীয় অঞ্চলে বৃহৎ চিংড়িঘের ও ব্যক্তিগত সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে; যে কোন সরকারি ক্রয়ে (বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়) অথবা বড় ধরণের বিনিয়োগে এদেরকে কমপক্ষে ২০ শতাংশ কমিশন দিতে হয় ইত্যাদি। আর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বহিঃপ্রকাশ বহুমুখী: অর্থনীতির দুর্বৃত্তরা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান এমনভাবে দখল করেন যেখানে সংবিধানের বিধি মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালন অসম্ভব। তারা মূল ধারার ক্ষমতার রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান-ব্যক্তিকে ফান্ড করেন; তারা ঘুষ-দুর্নীতিতে পৃষ্ঠপোষকতা করেন; তারা রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ নির্ধারণ ও ভোগ করার বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করেন; তারা লুট করেন সবকিছু— জমি, পানি, বাতাস এমনকি বিচারের রায়; তারা ধর্মের লেবাস যত্রতত্র ব্যবহার করেন– স্ব-ধার্মিকতা প্রদর্শনে হেন কাজ নেই যা করেন না; জাতীয় সংসদের আসন কিনে ফেলেন— তারা জানেন স্থানভেদে ৫ কোটি টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে জাতীয় সংসদের একটি আসন ক্রয়/দখল সম্ভব এবং সেটা তারা প্রাকটিশ করেন। অর্থনীতি ও রাজনীতির এসব দুর্বৃত্তদের প্রতি মানুষের মনের গভীরে অনাস্থা আছে; মানুষের সামনে এখন আর রাজনৈতিক 'role model' বলে কিছু নেই— এসব প্রবণতা যে হতাশা-নিরাশা-ক্ষোভ-অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে সেগুলোই হয়ে দাঁড়িয়েছে উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের সংগঠন বিস্তৃতির সহায়ক উপাদান।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের কারণে মানুষ তথাকথিত গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের প্রতি আস্থা হারাচ্ছেন-হারিয়েছেন, আর প্রগতির ধারাও সেই সাথে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়নি-হচ্ছে না। মানুষ যখন ক্রমাগত বিপন্ন হতে থাকেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারান এবং আস্থাহীনতা যখন নিয়মে পরিণত হয় তখন ব্যাপক সাধারণ জনমানুষ উত্তরোত্তর অধিক হারে নিয়তি নির্ভর হতে বাধ্য হন। আর এ নিয়তি নির্ভরতা বাড়ছে কৃষিপ্রধান অর্থনীতিতে যেখানে ৬০ ভাগ কৃষকই এখন ভূমিহীন, যে কৃষি ভিত্তির উপরই এদেশে বিকশিত হয়েছে ধর্ম। এ ভ্যাকুয়াম-টাই ব্যবহার করছে মৌলবাদী রাজনীতি।

মৌলবাদ জানে যে দলীয় রাজনীতিকে স্বয়ম্ভর করতে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভীত প্রয়োজন। অন্যথায় ক্যাডারভিত্তিক দল গঠন ও পরিচালন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের মডেল চর্চা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এখন ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতির সহায়তায় মৌলবাদ যে সব আর্থ-রাজনৈতিক মডেলের তুলনামূলক কার্যকারিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে তার মধ্যে ১২-টি বৃহৎ বর্গ হল নিম্নরূপ: আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ঔষধ শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, ধর্ম প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ-পরিবহন ব্যবস্থা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এস্টেট, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি, স্থানীয় সরকার, বেসরকারি সংস্থা, বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম, এবং কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলি মুনাফা অর্জনযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয় (যেমন স্থানীয় সরকার ও পেশাজীবী সমিতি)-এক্ষেত্রে ক্রস-ভর্তুকি দেয়া হয় এবং সেই সাথে মুনাফা-অযোগ্য প্রতিষ্ঠানেও তারা উচ্চ মুনাফা করেন (যেমন বাংলাভাই জাতীয় প্রকল্প যেখানে ভূমি খাজনা, চাঁদাবাজি প্রতিষ্ঠা করা হয়; এমনকি কোনো কোনো অঞ্চলে মাদ্রাসাতেও অত্যুচ্চ মুনাফা অর্থাৎ বছর শেষে ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি হয়)। মানুষের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি ব্যবহার করে আপাতদৃষ্টিতে মুনাফা অযোগ্য প্রতিষ্ঠানে মুনাফা সৃষ্টির তুলনামূলক সুবিধা (comparative advantage) তাদের আছে।

মৌলবাদের অর্থনীতির এসব মডেলের ব্যবস্থাপনা-পরিচালন কৌশল সাধারণ ব্যবসায়ের নীতি-কৌশল থেকে অনেক দিক থেকে ভিন্ন। তাদের অর্থনৈতিক মডেল পরিচালন কৌশলের অন্যতম কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ: (১) প্রতিটি মডেলই রাজনৈতিকভাবে উদ্বুদ্ধ উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রাজনৈতিক লক্ষ্যার্জনে নিয়োজিত; (২) প্রতিটি মডেলে বহুস্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় যেখানে নির্দিষ্ট স্তরের মূল নীতি-নির্ধারণী কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীনস্থ; (৩) বিভিন্ন মডেলের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন থাকলেও উচ্চস্তরের কো-অর্ডিনেটরদের পরস্পর পরিচিতি যথেষ্ট গোপন রাখা হয় (এক ধরণের গেরিলা যুদ্ধের রণনীতি বলা চলে); (৪) প্রতিটি মডেলই সুসংবদ্ধ-সুশৃংখল (সামরিক শৃংখলার আদলে) ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠান; (৫) যে কোনো মডেল যখনই আর্থ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ফলপ্রদ মনে করা হয় তা যথাসাধ্য দ্রুত অন্যস্থানে বাস্তবায়িত (replicate) করা হয়। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মৌলবাদীরা তাদের অর্থনৈতিক মডেল বাস্তবায়নে "রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে" রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তা বাস্তবায়নে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে তারা তাদের মত করে ঢেলে সাজাতে সচেষ্ট। এ থেকে এও প্রতীয়মান হয় যে মৌলবাদীর মূলে আছে ভীতি ও আবেগ। আর এ আবেগ আসে ক্রমবর্ধমান অসমতা থেকে তথাপি এসব আবেগানুভূতি কেবল সেকেলে এবং পিছুটান নয় বরং তারা সৃজনশীল এবং 'আধুনিকতা'র ধারক বাহকও।

অনেকেই মনে করেন এ দেশে সশস্ত্র জঙ্গি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনে সব অর্থ বিদেশ থেকেই পেয়ে থাকে। এ ধারণা বহুলাংশে মিথ্যে হতে পারে যদিও সম-মতাদর্শী বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে তাদের যৌথ উদ্যোগের ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। আর সেই সাথে তাদের নিয়ন্ত্রিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের অনুদানের বড় অংশ বিদেশ থেকেই আসে। উল্লিখিত ধারণা বহুলাংশে সত্য নয় এজন্য যে মৌলবাদ ইতোমধ্যে তার নিজস্ব অর্থনৈতিক শক্ত ভিত তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে এবং ঘটছে তা হল এরকম— উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বাহক শক্তিটি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের সম্পদ হরিলুট করেছে এবং পরবর্তিতে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনে ১৯৭০-৮০-র দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সরবরাহ পেয়েছে; এসব অর্থ সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক মডেল গঠনে বিনিয়োগ করেছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা করছে; আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে, একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর (কখনও কখনও) একাংশ নূতন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে।

আমার ২০১৪ সনের হিসেবে বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতির বার্ষিক নীট মুনাফা আনুমানিক ২,৫০০ কোটি টাকা (৩২০ মিলিয়ন ডলার)। এ মুনাফার সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ আসে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে (ব্যাংক, বীমা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি); দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৮.৮ শতাংশ আসে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে; বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে

আসে ১০.৮ শতাংশ; ঔষধ শিল্প ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারসহ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ১০.৪ শতাংশ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আসে ৯.২ শতাংশ; রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে আসে ৮.৫ শতাংশ, সংবাদ মাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তি থেকে আসে ৭.৮ শতাংশ, আর পরিবহন-যোগাযোগ ব্যবসা থেকে আসে ৭.৫ শতাংশ (হিসাবের পদ্ধতিতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত: ২০১৩, বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি)।

মৌলবাদের শক্তি-ভিত্তি নির্ণয়ের অন্যতম মানদণ্ড হিসেবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় উগ্রবাদের সম্পৃক্ততা ও ব্যাপকতাকে বিবেচনায় আনা যেতে পারে। বিগত ১৫ বছরে ১৯৯৯-২০১৪ সময়কালে বাংলাদেশে এ ধরনের ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণে দেখা যায় ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনশীল এক চিত্র। যার সাথে যুক্ত হয়েছে 'লুক্কায়িত থেকে প্রকাশ্য' পদ্ধতি, 'একমুখী হাতিয়ারের পরিবর্তে বিধ্বংসী বোমা ব্যবহার'। এসবের বিশ্লেষণে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের সুদূরপ্রসারী কিছু উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে: (১) রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের লক্ষ্যে সংস্কৃতি ধারায় পরিবর্তন আনা যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এ জন্য তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমন: জেলা প্রশাসন ও আদালত); ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন থিয়েটার, প্রেক্ষাগৃহ, জনসমাবেশ, কমিউনিটি সেন্টার, লাইব্রেরী; ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু জামাতের রাজনীতি বিরোধী যেমন সুফি-সমাধিস্থল-মাজার কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। (২) রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আসীন থাকলে এ ধরনের সন্ত্রাসী প্রবণতা হয় হ্রাস পায় অথবা প্রবনতার রূপ পরিবর্তিত হয়। (৩) ডানপন্থী বা ধর্মনির্ভর দলের সরকার ক্ষমতাসীন হলে এদের সন্ত্রাসী নেটওয়ার্কের বহুমুখী সম্প্রসারণ ঘটে। (৪) তাদের এ অপতৎপরতা বাধাগ্রস্ত না হলে ধর্মভিত্তিক জঙ্গিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় আর বাধাগ্রস্ত হলে জঙ্গিত্ব বৃদ্ধির ধরন পাল্টায়। ক্ষমতার ভাগাভাগিতে তাদের ভূমিকা না থাকলেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কোনো সরকার যদি ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়, মৌলবাদ তখন এটাকে তাদের শক্তি সামর্থ শাণিত করার কৌশলিক সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে মৌলবাদের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট রাজনীতির উদ্ভব, বিস্তৃতি ও সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা বলা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে স্বাধীনতার বিজয় নিয়ে আমরা যথেষ্ট মাত্রায় আত্মতুষ্ট ছিলাম। সঙ্গত কারণও ছিল। জাতি হিসেবে আমরা এইই প্রথম দেখলাম যে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা— এ চার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশগঠন ও রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। মূল স্রোতের ধর্মীয় চেতনা যদি উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী হয়ে থাকে এবং তা বংশপরম্পরা মানস-কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র গঠনের ঐ চার মূলনীতিও আমাদের সুপ্ত আকাঙ্খার সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ ছিল। আমাদের আত্মতুষ্টির কারণ এও হতে পারে যে সম্ভবত: তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষত মুসলিম প্রধান দেশসমূহের মধ্যে আমরাই প্রথম, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাকে (secularism, ধর্মহীনতা নয়) সংবিধানে (১৯৭২-এর) অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম (অবশ্য বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে পরবর্তীতে মুক্তিসংগ্রামের চেতনা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল মুশতাক-সায়েম-জিয়া অসাংবিধানিক-অবৈধ সরকার সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতি বাতিল করে সংবিধানে "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম" সংযোজন করেছে)। আমাদের সুপ্ত ইচ্ছা-আকাঙ্খার কাগুজে প্রকাশে আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম। কিন্তু ধর্মীয় উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি (যাদের ক্ষমা করে আমরা ইসলাম ধর্মের মূল স্রোতের বাহকে পরিগণিত হতে পারি) পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলো যে রাষ্ট্র যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতে মানুষের জীবনে মৌলিক কোনো পবিবর্তন ঘটবে না; তারা ভবিষ্যৎ প্রক্ষেপণ করতে পেরেছিলো যে এ মানুষই কয়েক বছরের মধ্যে চলমান নেতৃত্বের প্রতি মোহহীন হবে, আর এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তাদের (মুক্তিসংগ্রামে পরাজিতদের) বিজয় নিশ্চিত হবে। সমসাময়িককালে প্রগতির গতি এগুলো ঢিমে তালে আর তারা লক্ষ্যার্জনে জোরকদমে অথচ বেশ গোপনে এগুবার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলো (যেমন গ্রাম থেকে শহর দখল; কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত রাজনৈতিক পরিচিতি গোপন রাখা ইত্যাদি)। যে প্রস্তুতির ফলশ্রুতিই হলো গ্রাম দখল (ডিপ টিউবওয়েলকেন্দ্রিক সমিতি, কৃষক সমিতি, মসজিদ-মাদ্রাসা– মাধ্যম যাই হোক না কেন), ধর্ম প্রতিষ্ঠানে একচ্ছত্র অবস্থান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান দখল, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান দখল, আর বেসরকারি সংস্থার নামে ব্যাপকভাবে গ্রাম ও শহরের স্বল্পবিত্ত-দরিদ্র মানুষের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ ও তা সুদৃঢ়করণ। এ কৌশল কার্যকর করতে মৌলবাদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানমূহ যেমন নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে তেমনি এ কৌশল অবলম্বনের ফলে ঐসব প্রতিষ্ঠানও শক্তিশালী হয়েছে। এ নিরিখে ধর্মীয় মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির নেতৃত্ব যত না ভাববাদী তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি বাস্তববাদী-বস্তুবাদী। গত অর্ধ শতাব্দীর এ প্রক্রিয়ায় এখন তাদের অর্জনটা এমন যে একদিকে প্রতিটি জাতীয় সংসদ আসনে তারা গড়ে ১৫,০০০ ভোট সংগ্রহে সক্ষম আর অন্যদিকে নির্বাচনে কোটি কোটি টাকার কালো টাকা ও প্রয়োজনীয় পেশী শক্তি সরবরাহের ক্ষমতাও তাদের এখন আছে। আবার একই সাথে পাশাপাশি তারা এখন মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যেই অতি উচ্চমাত্রার সেনা-সুক্ষতাসহ সারা দেশে সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পরিচালনে এবং

কল্পনাতীত হত্যাযজ্ঞ সাধনে সক্ষম। জনগণ বাধা না দিলে তারা তা অবশ্যই করবে, তার পুনরাবৃত্তি হবে এবং এসবের তীব্রতা ও ক্ষতিমাত্রা বাড়তে থাকবে। এ কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয়। এ প্রতিপক্ষ বিভিন্নভাবে আন্তসম্পর্কিত ও কৌশলিক সুসংগঠিত এবং তা দেশিয় ও আন্তর্জাতিকভাবে। এ প্রতিপক্ষ আসলে ত্রিভুজাকৃতির আন্তসম্পর্কিত তিন বাহুর সমাহার মাত্র: উপরের বাহুতে আছে 'ইসলাম' নামাঙ্কিত মূল ধারার রাজনৈতিক দল— জামায়াতে ইসলাম (প্রকাশ্য সংগঠন যার বহু ধরনের আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক উপসংগঠন-অঙ্গ সংগঠন আছে), আর নীচের এক বাহুতে আছে ১২৫টি চিহ্নিত জঙ্গি সংগঠন আর অন্য বাহুতে আছে মৌলবাদের অর্থনীতিসহ ২৩১টি বেসরকারী সংস্থা, ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশন। শেষোক্ত এসব ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনসমূহ মৌলবাদের অর্থনীতি-উদ্ভূত মুনাফা পাচারের কৌশলিক সংস্থা মাত্র, যেসব সংস্থার মাধ্যমে তাদের জঙ্গিবাদী কর্মযজ্ঞসহ প্রস্তুতিমূলক বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। মৌলবাদী অর্থনীতির বিগত চার দশকে পুঞ্জিভূত নীট মুনাফার পরিমাণ হবে বর্তমান মূল্যমানে আনুমানিক প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা, যার ব্যাপকাংশ তারা এখন ব্যয় করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ প্রলম্বিত করতে, বিদেশী লবিস্টদের ভাড়া করার কাজে, জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, নতুন ক্যাডার বাহিনী গঠনে এবং সংশ্লিষ্ট সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে।

বাংলাদেশে রেন্ট সিকারদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুবর্ত্তায়নের সাথে এখন যুক্ত হয়েছে সশস্ত্র মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ। এ জঙ্গিবাদ অতীতে তাদের জঙ্গিত্ব প্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে। আর এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে তা অত্যন্ত পরিকল্পিত এবং যথেষ্ট কৌশলিক; ইতোমধ্যে তারা তাদের সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শন করে অনেক নিরীহ মানুষ হত্যা করেছে; তাদের বোমায় ইতোমধ্যে বহু নীরিহ মানুষ চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ প্রক্রিয়ায় আত্মঘাতি বোমারু হিসেবে যাদের ব্যবহার করা হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত পরিবারের বেকার মানুষ এবং প্রায় সকলেই আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা শিক্ষালয় থেকে এসেছেন এবং প্রায় সকলেই একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অনুসারি।

ধর্মীয় মৌলবাদ ও তৎউদ্ভূত উগ্র জঙ্গিবাদ যে "আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতি" চালু করেছে তার ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জীবন বিপন্ন প্রায়। মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া যতই ত্বরান্বিত হচ্ছে এ বিপন্নতা ততই বাড়ছে। তবে বস্তনিষ্ঠ সত্য ভাষ্যের স্বার্থে এখানে আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঐ বিচার প্রক্রিয়া বিচার-সম্ভাব্য মামলার তুলনায় এখনও যথেষ্ট মাত্রায় ধীর গতিসম্পন্ন (বিষয়টি চতুর্থ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছি)।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌলবাদী জঙ্গিবাদ-উদ্ভূত পরিকল্পিত বিপন্নতার কিছু নূতন মাত্রা লক্ষণীয়: (১) এ জঙ্গিত্ব দেশের উৎপাদনশীল খাতসমূহের "সরবরাহ চেইন" (supply chain) ভেঙ্গে ফেলে উৎপাদন-বণ্টন-পরিভোগ-এর স্বাভাবিক সিষ্টেমকেই ভেঙ্গে ফেলার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট। (২) এ জঙ্গিত্ব অর্থনৈতিক কাঠামো বিকল করার লক্ষ্যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যের এবং কাঁচামাল পরিবহনের অবাধ স্বাভাবিক সরবরাহ চেইন অচল করে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান যেসব পদ্ধতি তারা ব্যবহার করেছে তার মধ্যে আছ হরতাল, অবরোধ, অগ্নি সংযোগ, সড়ক পথে চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি, ট্রাক-বাস-রেলে অগ্নি সংযোগ, শিল্প প্রতিষ্ঠান ভাংচুর, মিথ্যাচারে মসজিদের মাইক ব্যবহার, ইত্যাদি। (৩) এ জঙ্গিত্ব অর্থনীতির প্রাণ-সংযোগ (life line)— অবকাঠামো গুড়িয়ে দিতে চায়। এ লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যে গান পাওডার ব্যবহার করে পল্লী বিদ্যুৎ উড়িয়ে দিয়েছে; প্রতিহত না করতে পারলে তারা আরো সম্ভাব্য যা করবে তা হলো— বিদ্যুতের জাতীয় গ্রীড অচল করবে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিকল করবে, বিদ্যুত উৎপাদন থেকে সঞ্চালন বিনষ্ট করবে; (শহরে) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অচল করে দেবে (প্রয়োজনে পানি সরবরাহে কলেরার জীবাণুসহ বিষ প্রয়োগ করবে); রাস্তা-ঘাট-ব্রিজ-কালভার্ট চলাচল অনুপযোগি করার চেষ্টা করবে। (৪) এ জঙ্গিত্ব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান অকার্যকর করতে চায়। (৫) এ জঙ্গিত্ব এখন দেশের গ্রামাঞ্চল, ক্ষুদ্র শহর ও শহরতলীতে তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করছে। যার মূল উদ্দেশ্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল ইঞ্জিন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের কর্মকাণ্ড বিনষ্টের মাধ্যমে পুরো অর্থনীতিকে নীচে থেকে ভেঙ্গে ফেলা। (৬) এ জঙ্গিত্ব তাদের কমর্কাণ্ড দিয়ে এমন এক ত্রাস সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছে যখন গ্রামের হাটবাজার সন্ধ্যার পরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলতঃ গ্রামের বাজারে সন্ধ্যার পরে সার, ডিজেল, বীজসহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে, যার ফলে আশংকা করা যায় যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মজুতদারী বাড়বে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি রূদ্ধ হবে। এ আশংকা অমুলক নয় যে একদিকে যেমন গ্রামীণ অর্থনীতিতে কালোবাজারী-মজুতদারী বৃদ্ধির ফলে ক্রমান্বয়ে জনজীবণ অধিকতর দুর্বিষহ হবে, আর অন্যদিকে এ অবস্থাকেই আবার জঙ্গিরা তাদের জঙ্গিত্ব আরো বাড়ানোর যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করবে। (৭) এ জঙ্গিত্ব এখন হেফাজতে ইসলামের নামে

আপাতত ঢাকার শাপলা চত্বরে ইসলাম ধর্মের হেফাজতের অজুহাতে সংবিধান বিরোধী ও নারী বিদ্বেষী ১৩ দফা দাবী নামা পেশ করে নাস্তিক-আস্তিক বিভাজনের মাধ্যমে দেশে গৃহযুদ্ধাবস্থা সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আপাতত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বন্ধ করা এবং জামাত-ই-ইসলামীর নিষিদ্ধকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করা; আর আসল উদ্দেশ্য হল ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতাকেই দখল করা। (৮) এ জঙ্গিত্ব আস্তিক-নাস্তিক বিতর্কের সূত্রপাত করে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চসহ দেশের দেশপ্রেমিক তরুণ প্রজন্মকে জোর করে অন্ধকার যুগে ঠেলে দিতে চায়। (৯) এ জঙ্গিত্ব ইতোমধ্যে নাস্তিকতার অজুহাতে মুক্তবুদ্ধির-মুক্তচিন্তার অনেক মানুষ হত্যা করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো করবে। (১০) এ জঙ্গিত্ব ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন-নিবর্তন করে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করতে চায়। (১১) এ জঙ্গিত্ব সমগ্র দেশে ভয়-ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে যে হারে আত্মঘাতি বোমা ব্যবহার করেছে এবং করবে তাতে বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত বিনিয়োগহীন এক অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হবে যখন ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র অর্থনীতি-ব্যবস্থা। আর এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল অসম্ভব নয়। সুতরাং, তারা ধর্মকে ব্যবহার করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার স্বার্থে অর্থনৈতিক-সামাজিক অবকাঠামো অচল ও ভেঙ্গে ফেলাসহ জনমনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করবে– এটাই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রু। এ শত্রুদের প্রতিশোধস্পৃহা ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা ধর্মের নামে নির্বিচারে মানুষ খুন করেছে ও করবে। উগ্র সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী এ জঙ্গিরা ধর্মের নামে জোরজবরদস্তি করে রাষ্ট্রক্ষমতাটিকেই দখল করতে চায়। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিবাদ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে চলেছে। ওদের জঙ্গিত্ব ক্রমান্বয়ে অতীতের সকল সীমা অতিক্রম করছে— প্রথমে নিরীহ বেশে ধর্মের বাণী, তারপরে শরীর চর্চার নামে একটু-আধটু প্রশিক্ষণ, তারপরে পটকার খেলা, তারপরে স্পিলিন্টার ছাড়া বোমা, তারপর পিস্তল-রিভলভারের খেলা-প্রদর্শন, তারপর সভাস্থলসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বোমা মেরে মানুষ হত্যার মাধ্যমে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি হত্যার প্রয়াস, তারপর বাঙ্গালী জাতিকে রাজনীতিবিদ শূন্য করার প্রচেষ্টা, তারপর এক সাথে একই সময়ে দেশের সব জেলা শহরের সরকারি অফিস ও বিচারালয়ে বোমা, তারপর বিচারক হত্যা, পেট্রোল বোমায় গান পাউডার দিয়ে পুড়িয়ে-ঝলসিয়ে শিশু-নারী-বয়োবৃদ্ধ মানুষ নির্বিশেষে হত্যাকাণ্ড নিয়মিতকরণ করা, আর সবশেষে সুইসাইড বোমা। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্বের ক্রমধারা যা তাতে স্পষ্ট যে ওরা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং সুইসাইড বোমাই শেষ কথা নয়। যদি নিরস্ত্র করা না যায় তাহলে সামনে সম্ভবত আরো বড় মাপের নূতন ধরনের বিপর্যয় ঘটবে যা হয়তো বা এ মুহূর্তে কল্পনাও করা যাচ্ছে না। আমাদের ইতিহাসে এ কোনো সাধারণ সংকট নয়— প্রকৃত অর্থেই মহা-বিপর্যয়; গভীর সংকটের এ এক ক্রান্তিকাল।

ইসলামী জঙ্গিত্ব-উদ্ভূত মহাসংকটের গভীরতা এখানেও যে ইতোমধ্যে প্রথম ১০ বছরে ধৃত জঙ্গিদের প্রায় সবাই দরিদ্র-নিম্নবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; এদের মধ্যে যারা স্বাক্ষর তাদের প্রায় সবাই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে এসেছেন; এদের প্রায় সবাই কোনো না কোনোভাবে ধর্ম-ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন অথবা আছেন। আবার পাশাপাশি ইদানিং ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মভিত্তিক উগ্রজঙ্গিবাদের সাথে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয়ভাবে জড়িত ধনী ঘরের সন্তান এবং ইংরেজী মিডিয়াম স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। আরো দুশ্চিন্তার বিষয় এই যে এখন পর্যন্ত ধৃত ২ হাজার জঙ্গিদের গড় বয়স মাত্র ২২ বছর (১৬ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে)। অথচ ১৫-২০ বছর আগে গণমাধ্যমে জঙ্গি প্রশিক্ষণের যেসব সচিত্র খবর প্রকাশিত হয়েছিল অথবা ১০-২০ বছর আগে যারা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বার্মাতে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের বয়স তো এখন হবে ৪৫-৫৫ বছর– তারা কোথায়? আর যারা ১৯৭১-এ আলবদর-আলশামস-রাজাকার-শান্তিকমিটির নামে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন এবং/অথবা সরাসরি খুন-হত্যা-জখম-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগে জড়িত ছিলেন, এবং/অথবা মুখ্য পরামর্শদাতার কাজ করেছিলেন তাদের বয়স তো এখন ৬০-৮৫ বছরের মধ্যে— তারা কোথায়? এসব গডফাদারদের বড় অংশই ১৯৭১-এ মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন। এসব গডফাদারদের অনেকেই এখনও বহাল তবিয়তে দেশ-বিদেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করারও এ এক নবতর কৌশল হতে পারে। মহাবিপর্যয়টি এখানেও।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী রাজনীতি কোনো দুর্বল প্রতিপক্ষ নয় এ জন্যেও যে তারা ইসলামের মুলমন্ত্র পরিত্যাগ করে "অর্থনৈতিক ক্ষমতাভিত্তিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া"-কে (economic power based political process) রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। ধর্মকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের এ কৌশল আসলে ধর্মের 'mythos'-এর সাথে বাস্তবের 'logos'-এর সম্মিলনের এক আধুনিক পদ্ধতি মাত্র (খোমেনি

পদ্ধতি)। এ পদ্ধতিতে ধর্মকে "রাজনৈতিক মতাদর্শে" রূপান্তর করা হচ্ছে। ধর্মভিত্তিক এ রাজনৈতিক মতাদর্শ ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-মৌলবাদী জঙ্গিত্ব ও মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে এখন থেকে দশবছর আগেই হুশিয়ারি প্রক্ষেপণ করে লিখেছিলাম, সমগ্র বিষয়টি দাঁড়িয়েছে এরকম: "স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার প্রতিপক্ষ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তি জানে তারা কি চায়, বিপরীতে আমরা জানি না আমরা কি চাই; ওরা জানে কেমন করে তা অর্জন করবে, বিপরীতে আমরা জানি না; ওরা তাদের লক্ষ্যার্জনে সুসংগঠিত, আমরা অসংগঠিত; লক্ষ্যার্জনে ওদের মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই, বিপরীতে আমাদের দ্বিধা আছে; ওরা যা করছে তা তারা গভীরভাবে বিশ্বাস করে, আর আমরা নিজেদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি বলে মনে হয়; ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, যুব সমাজের বেকারত্ব হতাশাকে ওরা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাতে সিদ্ধহস্ত, আর আমরা "দরিদ্র মানুষ-যুব বেকার-হতাশা"-র বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম এড়িয়ে চলেছি। আমাদের অস্বচ্ছতা ও অনৈক্য ওদের ভীত শক্তিতে সহায়ক হচ্ছে" (আবুল বারকাত, ২০ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ)।

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিত্ব আস্তে আস্তে যে রূপ ধারণ করেছে তা থেকে আমি অন্তত: নিশ্চিত যে "এ মুহূর্তে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"— এমনটি ভাবলে বাস্তব সত্য অস্বীকার করা হবে, আর তা হতে পারে উচ্ছ্বাস-উদ্ভূত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তিরও কারণ। সুতরাং মহাবিপর্যয় রোধে আশু (স্বল্প মেয়াদি) ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক জঙ্গিত্ব এখনই নির্মূল সম্ভব নয় কারণ যে ভিত্তির ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে তা সহজে ভেঙ্গে ফেলা যাবে না। বাস্তবে যা সম্ভব তা হল "ক্ষতি হ্রাসের" কৌশল (damage minimizing strategy) দ্রুত বাস্তবায়ন করা। স্বল্প মেয়াদি সমাধান হিসেবে 'ক্ষতি হ্রাস কৌশল" হতে পারে একই সাথে কয়েকটি কাজ করা: (১) ১৯৭১-এ যারা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ করেছেন— যারাই মৌলবাদী জঙ্গিদের গডফাদার— তাদের বিচার কাজ যথা দ্রুত সম্পন্ন করে শাস্তি কার্যকর করা। (২) জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎস সম্পর্কে সরকারের যা কিছু জানা আছে তা অতি দ্রুত গণমাধ্যমে প্রকাশ-প্রচার করা। (৩) জঙ্গিদের অর্থ ও অস্ত্রের উৎসমূখ বন্ধ করা। (৪) মৌলবাদের অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তৃতীয়-পক্ষীয় অডিট করে জঙ্গি অর্থায়ন সংশ্লিষ্টতা উদঘাটন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তকরণ, আইনি হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন, পর্ষদ পরিবর্তন ইত্যাদি। (৫) জঙ্গিদের সংশ্লিষ্ট সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা। (৬) বাজেয়াপ্তকৃত এ সম্পদ সরকারের তত্ত্বাবধানে এনে ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করেছেন, ইজ্জত-সম্ভ্রমহানীর শিকার হয়েছেন, অস্বচ্ছল জীবন-যাপন করছেন, এবং বিগত ৪০ বছরে মৌলবাদী জঙ্গিত্বের কারণে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পঙ্গুত্ববরণসহ আহত হয়েছেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের দেয়া, সেইসাথে সামাজিক-সাংস্কৃতিক মানব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তা ব্যয় করা। (৭) জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত সবাইকে ধরা এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া। (৮) সরকারের মধ্যেই যারা জঙ্গিত্ব-প্রমোটার তাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া এবং সরকার থেকে তাদের বহিষ্কার করা। (৯) ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আন্দোলন-সংগ্রাম জোরদার করা। (১০) ব্যাপক জনগণের মধ্যে জঙ্গিদের প্রকৃত চেহারা-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উন্মোচনে সিরিয়াস প্রচারমূলক কর্মকাণ্ড করা যাতে জনগণই এ প্রক্রিয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। আশু ও স্বল্প মেয়াদি এ কার্যক্রমে একদিকে যেমন রাষ্ট্র ও সরকারকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে অন্যদিকে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সুসংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং এক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে একটি— তা হলো দেশে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্য বিলোপসহ অসাম্প্রদায়িক মানস কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উভয় লক্ষ্য বাস্তবায়নে অসাম্প্রদায়িক সকল মানুষের সচেতন ঐক্যের কোনোই বিকল্প নেই।

মৌলবাদী অর্থনীতি, উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট মৌলবাদী জঙ্গিত্ব — এসবই পশ্চাৎপদ। সুতরাং পশ্চাৎপদতা অপসারণ ও প্রগতি নিশ্চিতকরণে উল্লিখিত কর্মপ্রণালীদ্বয়ের ভিত্তিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার কোনো বিকল্প নেই। ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনগণের সুদৃঢ় এ ঐক্যের ভিত্তিতে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে নিচ্ছিদ্রভাবে সে শর্ত সৃষ্টি করতে হবে যখন এদেশে আর কেউ যেন জন্মসূত্রে দরিদ্র না হতে পারে। আর সে লক্ষ্যে মুক্তি সংগ্রামে অর্জিত জনগণের আকাঙ্ক্ষার সর্বোচ্চ আইন ১৯৭২-এর মূল সংবিধানে প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের অংঙ্গিকার "আমরা অংঙ্গিকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র,

গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূল নীতি হইবে" (১৯৭২ এর মূল সংবিধান, প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ), মূল সংবিধানের দশম অনুচ্ছেদ (যা বঙ্গবন্ধু হত্যাপরবর্তী অবৈধ জিয়া সরকার ১৯৭৮-এ বাতিল ঘোষণা করেন) যেখানে জনগণের সুস্পষ্ট রায় বিধৃত ছিল এভাবে যে, "মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে"—সংবিধানে বিধৃত এসব গণ-অঙ্গীকার ও গণরায় সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এবং অখন্ডিতভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে। এসবের ভিত্তিতেই বাস্তবায়ন করতে হবে সংবিধানের জনকল্যাণকামী মূল বিধানসমূহ যার মধ্যে আছে মানুষের সমমর্যাদা, সব মানুষের সমসুযোগের অধিকার, কাজ পাবার অধিকার, বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা পাবার অধিকার এবং স্বাস্থ্যসেবা পাবার অধিকার ইত্যাদি। মানুষের স্বাভাবিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী এসব সুযোগের অভাবই সে হতাশা-নিরাশা সৃষ্টি করে যার উপরই ভর করে ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িকতা। দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে মাত্রা নিয়েছে তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সংকট নিরসনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও কালক্ষেপণ মহাবিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

৬। উপসংহারিক বক্তব্য:

শোষণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকেই উচ্ছেদ করতে হবে

এ প্রবন্ধে "বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসবের উদ্ভব-উত্থান-আবির্ভাব, ব্যাপকতা-বিস্তৃতি-সম্প্রসারণতার নির্মোহ-বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-এর চেষ্টা করা হয়েছে। এসবের কার্যকারণ নিরূপণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের জন্য প্রযোজ্য একটি রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্ব (Political economic theory) বিনির্মাণ করা হয়েছে। যে তত্ত্ব সবকিছুর উৎসবিন্দু বা শেকড় নির্ণয়ে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। তবে আমার তত্ত্বটাই সর্বোৎকৃষ্ট অথবা একমাত্র সঠিক তত্ত্ব এমন দাবি আপাতত করছি না। সামাজিক প্রত্যয়সমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মর্মবস্তু অনুসন্ধান কাজে সামাজিক গবেষকেরা প্রকৃতির বিধি-বিধানের সাথে সাযুজ্য রেখে এসব নিয়ে ভবিষ্যতে আরো জ্ঞানসমৃদ্ধ আরো বাস্তবধর্মী কাজ করবেন— এ আশা করতেই পারি। সেক্ষেত্রে এ প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বিয় সূত্রবদ্ধ করাসহ সংশ্লিষ্ট যে সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেসব কাজে লাগবে।

সমগ্রতার নিরিখে বিষয়টি এরকম: 'শোষণ' এবং শোষণ উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বৈষম্য-অসমতাই মূল কথা। নিজের দেশের মধ্যে শোষণ ব্যবস্থা বলবৎ রাখবেন যে ব্যবস্থা বৈশ্বিক শোষণ কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংগ আর একই সাথে চাইবেন বৈষম্যহীন সমাজ, সবার জন্য সুযোগের সমতা, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান নীতির ভিত্তিতে ন্যায়বিচার-ন্যায্যবিচার-আইনের শাসন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে মুক্তি, ধর্মসহ জাতি-বর্ণ-পেশা-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য সমান নাগরিক অধিকার ও মানব (মানবিক) অধিকার, ধর্মভিত্তিকসহ বিভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব থেকে মুক্তি, দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-জ্ঞানজাগতিক-মনোজাগতিক প্রগতি ও উৎকর্ষ সৃষ্টির পরিবেশ নিশ্চিত করে তাদের প্রকৃতই মুক্ত ও স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করা, শাসকদের স্বৈরাচার-স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরশাসন থেকে জনগণের মুক্তি, লুণ্ঠনকারী-দুর্বৃত্ত আগ্রাসী কর্তৃত্বশীল-আধিপত্যবাদী রেন্ট সিকারদের হাত থেকে মুক্তি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও মারপ্যাচ থেকে মুক্তি— এসবের কোনোটিই ঘটবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কার্যকারণগতভাবে বিষয়টি অর্থনৈতিক তবে রাজনীতিই মূখ্য। কারণ রাজনীতি অনুরূপ সাযুজ্যপূর্ণ রাষ্ট্রকাঠামো-সৌধ বিনির্মাণ করে দেয় এবং তা জিইয়ে রাখতে প্রধানতম (সম্ভবত 'একমাত্র' বললেও অত্যুক্তি হবে না) ভূমিকা রাখে। আর রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সরকারনীতি যখন শোষকদের-রেন্ট সিকার লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদের অধীনস্থ দাস সত্তায় রূপান্তরিত হয় তখন রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি-সরকারনীতির কোনটিরই প্রকৃত স্বাধীনতা থাকে না। কারণ, কার্য-কারণগতভাবেই বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন-ব্যবস্থা সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের সাধারণ প্রক্রিয়াকে নির্ধারণ করে; ইতিহাসের গতিপথে আবির্ভূত সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক, সমস্ত ধর্মীয় ও আইনগত ব্যবস্থা, সমস্ত তাত্ত্বিক মতবাদ অনুধাবন করা সম্ভব শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট যুগে বিদ্যমান জীবনের বৈষয়িক অবস্থা অনুধাবন করে; এবং মানুষের চৈতন্য তাদের অস্তিত্ব নির্ধারণ করে না, বরং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চৈতন্য নির্ধারণ করে।

"বিচারহীনতার সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মভিত্তিক মৌলবাদ, মৌলবাদী জঙ্গিত্ব"— এসব অশুভ শক্তি থেকে মুক্তির বিষয়টি তথাকথিত সংস্কার বা রিফর্ম সংশ্লিষ্ট গোঁজামিলের বিষয় নয়। সমাধানের বিষয়টি শেষ বিচারে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন বা আমূল পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট— এ নিয়ে আমার মধ্যে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা নিম্নমাত্রার সন্দেহ নেই।

তবে এ নিয়ে শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্তাবক-অস্তাবক চাটুকার-অচাটুকার নির্বিশেষে অনেকেরই সন্দেহ আছে, সন্দেহ থাকবে— এতেও আমার সন্দেহ নেই। কারণ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভু ও রেন্ট সিকার দুর্বৃত্ত-লুটেরা-পরজীবীদের মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্তাবক "বুদ্ধিজীবী শ্রেণি", "সুশীল সমাজ শ্রেণি", "নাগরিক সমাজ শ্রেণির" আমরা শ্রেণি স্বার্থের কারণেই রিফর্ম জাতীয় অথবা সরল বিবর্তন জাতীয় (বলা চলে "যেমন চলছে তেমনই চলুক" জাতীয়) সমীকরণের গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে নির্মোহ-বস্তুনিষ্ট-বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতির বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সত্য কথা বলতে অপারগ, ততোধিক অপারগ নির্মোহ ঐ সত্য বাস্তবায়নে সক্রিয় (active; proactive অনেক দূরের কথা) ভূমিকা রাখতে।

বর্ষাকাল এলেই গ্রাম দেশের গরীব মানুষ তাঁর কুঁড়েঘরটা বাঁচাতে এদিক-ওদিক থেকে চেয়ে-চিন্তে চার-পাঁচটা বাঁশ জোগাড় করে প্যালা দিয়ে ঝড়-ঝঞ্জা থেকে কুঁড়েঘরটিকে অন্তত "এবারের" মত রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এটাই ঠুকঠাক-টুকটাক সংস্কার বা রিফর্ম। প্যালা দিয়ে এই 'এবার' টি আর কতবার-কত বছর-কতকাল চলবে? গরীব মানুষের ঐ কুঁড়েঘরটির বয়স তো কমপক্ষে ৪০-৫০ বছর; কুঁড়েঘর ঘুণে ধরেছে, মহাঘুণ; ঘরের ভিতই দুর্বল হয়ে গেছে, মহা দুর্বল; ৪-৫ টা নয় ১০০-২০০ বাঁশ দিয়ে প্যালা দিলেও ঠেকানো যাবে না; একদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠির মাথা গোঁজার বসতঘরেই ঘুণ ধরেছে আর অন্যদিকে কিছু মানুষের আকাশ চুম্বি ভবন উঠছে। আদি পাপের যুক্তিসহ বিভিন্ন কুট-যুক্তি দেখিয়ে কেউ হয়তো বা বলবেন এটাই নিয়তি সুতরাং এটা চলবে, চলবে অনন্তকাল। মরদ-স্বল্প আমরা সে পক্ষেরই যারা মনে করেন– এমনই চলুক না অনন্তকাল। আর আমাদের মধ্যে যারা "ভালো মানুষ"(!) তারা আরো একটু বেশি সংস্কার বা রিফর্মের কথা আপ্ত বাক্যের মত আওড়াতে থাকবেন। অর্থাৎ "বাঁশ কাহিনী" সম্প্রসারণ করে বলতেই থাকবেন ৪-৫টি বাঁশ দিয়ে হবে না গরীব মানুষের জন্য দরকার ১০০-২০০ বাঁশ, বেশি বাঁশ-অনেক বেশি বাঁশ, যত বেশি বাঁশ— গরীবের তত বেশি মঙ্গল! আমি এই দুই "বাঁশ পন্থির" কোনো পক্ষেই নই— সচেতনভাবেই। তাই মনে করি অনেক হয়েছে "enough is enough"; গোঁজামিল হয়েছে অনেক; গোঁজামিল বন্ধ করা দরকার। সে কারণে আমার স্পষ্ট উপসংহার— আর সংস্কার (reform) নয় পরিবর্তন হতে হবে আমূল (radical); মৌলিক-আমূল এই পরিবর্তনের লক্ষ্য হবে "শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে-উপড়িয়ে বৈষম্যহীন-প্রগতিবাদী সমাজ-রাষ্ট্র বিনির্মাণ করা"। এ ধরনের সমাজ বিনির্মাণের মহানুভব প্রতিশ্রুতি তো ১৯৭২-এর মূল সংবিধানের "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি"তেই ছিল যা অবৈধ জিয়াউর রহমানের (মুক্তিযোদ্ধা?) সরকার ১৯৭৭ সালে ঘোষণা দিয়ে এবং ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয়বার ঘোষণা দিয়ে সংবিধান থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছেন (দেখুন, Proclamation Order No.1 of 1977. এবং Second Proclamation Order No. IV of 1978)। ১৯৭২-এর সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে এ নিয়ে স্পষ্ট যা লেখা ছিল তা হুবহু এরকম: ***"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।"***

আমি সম্পূর্ণ অবগত আছি যে আজ আমি যাদের সামনে এসব কথা বলছি তারা বা তাদের অধিকাংশই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট এ ইতিহাসের সাথী হবেন না; তবে সহমর্মী হলেও ক্ষতি নেই (সহমর্মিতা ধন্যবাদর্হ!) আমি জানি যে যারা এ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মূল নির্মাতা হবেন তারা জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হলেও সম্ভবত এখনও প্রস্তুত নন— লক্ষ্যার্জনে সংগঠিত নন, আবার এর অর্থ এও নয় যে তারা কখনও প্রস্তুত হবেন না, কোনো দিনও হবেন না। ইতিহাস উল্টোটা বলে।

আমার এসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার যেকোনো ব্যক্তিরই জন্মগত অধিকার। আমি সে অধিকারের প্রতি সম্মান যথার্থ রেখেই বলবো— আমার চিন্তার নিয়ন্ত্রক আমি নিজেই, অন্য কেউ বা কোনো শক্তি আমার চিন্তা পরিবর্তনের প্রতিকূল বাধ্য-বাধকতাজনিত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করতেই পারে কিন্তু তাতে করে আমার নির্মোহ যুক্তি-উদ্ভূত চিন্তা দূর করবে কিভাবে? সঙ্গত প্রশ্ন— তাহলে কি আমাদের সমাজ যেভাবে চলছে সেভাবেই চলতে থাকবে, আমূল পরিবর্তন হবে না? আমার সরাসরি উত্তর— মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বপ্রভুত্বের এ যুগে যখন তার প্রতিপক্ষ সমাজতান্ত্রিক ও সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শক্তি দুর্বল— তখন হবে না। এখানে দ্বিতীয় প্রশ্ন— সেটি যদি নাই হয় সেক্ষেত্রে শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে সমাজ বিপ্লব কি জরুরি? আমার সরাসরি উত্তর— হ্যাঁ জরুরি, এর কোনো বিকল্প নেই যদিও এদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ তাবেদার উপ-সাম্রাজ্যবাদীরা 'বিকল্প' অনুসন্ধানে বেশ কিছু এনজিও ও তথাকথিত থিঙ্ক ট্যাংকে বেশ অর্থ ব্যয় করছে।

বৈপ্লবিক আমূল কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা সতর্কতামূলক বক্তব্য উচ্চারণ করে শেষ করতে চাই, তাহলো বৈশ্বিক আর্থ-রাজনৈতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির যে কাঠামো এখন বিদ্যমান-চলমান সে অবস্থায় শোষণভিত্তিক আর্থ-

সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বকারী দেশসমূহের মধ্যে একক কোনো দেশের পক্ষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন-রূপান্তর সাধনের আপাতত কোনো সম্ভাবনা নেই। এ পরিবর্তন সম্ভব যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের একই লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই সাথে একই সময়ে ন্যায়সঙ্গত বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং সেই সাথে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকামী দেশসমূহের মধ্যে এক ধরনের কৌশলগত শক্তিশালী-কার্যকর জোট সৃষ্টি করা সম্ভব হয়; এ জোটের যৌক্তিক নাম হতে পারে "লিবারেশন ইন্টারন্যাশনাল" (অবশ্য কাজটা যারা করবেন নামটা সম্মিলিতভাবে তারাই ঠিক করবেন)। আমার এই প্রস্তাবনা কল্পনাবিলাস নয়। প্রকৃতির বিধি, উৎপাদিকা শক্তির নিরন্তর বিকাশ বিধি এবং তৎসংশ্লিষ্ট উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের যোগসূত্র, বিশ্বের অতীত (ইতিহাস) ও চলমান বাস্তবতা— এসবই প্রমাণ করে যে আমি যে স্বপ্নের কথা বলছি তা সময়ের নিরিখে খুব নিকট ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন যোগ্য না হলেও এ স্বপ্ন যুক্তিসঙ্গত-বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতির বিধানের সাথে সম্পূর্ণ সাযুজ্যপূর্ণ বিধায় অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই বাস্তবায়ন হবে। এখন দেখার বিষয়— বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃতির বিধানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ অনিবার্য এ রূপান্তরে সামনে কি ঘটে, কোথায় ঘটে, কিভাবে ঘটে এবং বৈশ্বিক সাম্রাজ্যবাদ তাদের জন্য বিপদজনক এসব 'অঘটন' কিভাবে মোকাবেলা করতে চেষ্টা করে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: প্রবন্ধটির মূল পাণ্ডুলিপি টাইপ ও পুনঃটাইপে ক্লান্তিহীন শ্রম দিয়েছেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টারের মো. মোজাম্মেল হক, পাণ্ডুলিপি টাইপের পরে একাধিকবার পাঠ করে ভুলত্রুটি সংশোধনে নির্ঘুম রাত্রি কাটিয়েছেন সেলিম রেজা, তথ্য সংগ্রহে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মো. কবিরুজামান, পাণ্ডুলিপির ভাষাশৈলি দেখে দিয়েছেন কাজী সালাহউদ্দীন, এবং কভার ডিজাইনসহ প্রেসে মুদ্রণের সব কিছু অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করেছেন আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং এর স্বত্বাধিকারী শাহিন আহমেদ– আমি এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। সবশেষে শিরোনামস্থ বিষয়ে সময়োপযোগি জাতীয় সেমিনারের সিদ্ধান্ত এবং আমাকে মূল প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ড. জামাল উদ্দিনসহ সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির সকলের প্রতি।